সামাজিক বিজ্ঞান

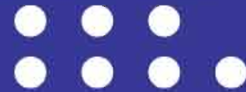
সপ্তম শ্রেণী













জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সামাজিক বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণী

রচনা

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী

মুহম্মদ আনসার আলী

লূৎফর রহমান

নাজনীন বেগম

সম্পাদনা

ড: মোস্তফা চৌধুরী

কাজী আব্দুর রউফ

ড: সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

ফজলুল হক খান

আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
সংশোধিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০১
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
ফাইন ডট লি:

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

চিত্রাঙ্কন
বিপ্লব সরকার
সমর মজুমদার

মানচিত্রাঙ্কন
দি ম্যাপ্‌পা
গ্রাফোসম্যান

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা, আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক–শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি ও জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়বস্তু সমন্বয়ে এবং নতুন নামকরণ ও আঙ্গিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়েছে। বিষয়টির পঠন–পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তন ও অগ্রগতির ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। আশা করা যায়, এটি পাঠে তরুণ শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে, সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন করবে এবং তাদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে। তদুপরি পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু অধ্যয়নের মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের উচ্চতর জ্ঞানলাভের ভিতও রচিত হবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

পরিবেশ ও সমাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিবেশ

আমরা যে স্থানে বাস করি সে স্থানে ও তার চার পাশের অবস্থাকে পরিবেশ বলে। ঘরবাড়ি, গাছপালা, নদীনালা, পাহাড় পর্বত, মাটি, বায়ু, পানি, আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব, প্রতিবেশী, পরিবার, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি এসব কিছু মিলেই তৈরি হয় পরিবেশ। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে গড়ে তোলার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সেসব নিয়েই পরিবেশ গঠিত হয়। মানুষ পরিবেশের সৃষ্টি। পরিবেশ দুই প্রকার – প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। দোলনায় দোল খেয়ে শিশু যেমন বড় হয় তেমনি পরিবেশের প্রভাবেও মানুষের প্রতিভার বিকাশ ঘটে। আমরা জানি কোন মানুষই একা বাস করতে পারে না। সে একটি পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই পরিবেশের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তাই পরিবেশ মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষের জীবনের বিকাশকে প্রভাবিত করে। ভাল পরিবেশ ভাল মানুষ তৈরি করে।

মানুষের আচার ব্যবহার ও জীবন ধারণের পদ্ধতি পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবেশের তারতম্যের ফলেই সমাজ জীবনে তারতম্য ঘটে। পরিবেশ মানুষের মাঝে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের সৃষ্টি করে। মানুষ সামাজিক নিয়ম কানুন, আচার–ব্যবহার মেনে চলে। মোটকথা মানুষের আচার আচরণ, ধ্যান–ধারণা, সুখ–শান্তি, আশা–আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ–উদ্দীপনা, কর্মপ্রেরণা, সফলতা ও ব্যক্তিত্ব এসব কিছুই পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকে। দেখা গেছে, পরিবেশের তারতম্যের ফলে মানুষের জীবন ও সামাজিক ব্যবস্থার ব্যবধান ঘটে।

সমাজ : মানুষ সামাজিক জীব। আদিকাল থেকে মানুষ দলবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে আসছে। প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন সমাজে বাস করে। দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন, 'যে লোক সমাজে বাস করে না, সে হয় দেবতা, নয় পশু'। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, মানুষ সমাজে জন্ম নেয় এবং সমাজে সারা জীবন অতিবাহিত করে। সমাজে মানুষ মিলেমিশে বাস করে, সুখে–দুঃখে, বিপদে–আপদে একে অপরকে সাহায্য করে, আদিকালে সমাজ গঠনের পূর্বে মানুষ যখন একা একা বাস করত, তখন সে ছিল অসহায়। রোগে–শোকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে তাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। জীবনের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে ও প্রতিকূল পরিবেশে একক জীবন বাঁচতে পারেনা। তখনই মানুষ দলগত জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। স্বাভাবিকভাবেই এসব বাধা–বিপত্তিকে জয় করার জন্য মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে।

এছাড়া জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের জন্যও সমাজ গঠন অত্যাবশ্যক। মানুষ তার জীবনের সকল প্রয়োজন একা মেটাতে পারে না। অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন। তার এ প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে উঠেছে সমাজ। মানুষ ছাড়া প্রাণীজগতের অনেক প্রজাতির মাঝেও এরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বেশির ভাগ প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালবাসে। যেমন–পিঁপড়া, মৌমাছি প্রভৃতি। প্রবৃত্তির কারণে তারা এভাবে চলে।

মানুষও তেমনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে পারেনা। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, মানব জীবনে নিরাপত্তা সুখ, শিক্ষা, চিকিৎসা, পুষ্টি, উপকরণ, সুযোগ এবং সমাজের দেওয়া আরও বহু ধরনের সুবিধার জন্য মানুষ সমাজের ওপর

নির্ভরশীল। সমাজ মানুষকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দান করে। সামাজিক মানুষ নিয়ম কানুন মেনে চলে। প্রতিটি মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য সমাজের অন্য মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। সমাজের বাইরে মানুষের মনুষত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ সাধনেই সমাজের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এসব কারণে স্বাভাবিকভাবে মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। মোট কথা, সমাজ বলতে আমরা সে জনসমষ্টিকে বুঝি যারা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।

অন্যকথায় সমাজ হল 'সম মনোভাবসম্পন্ন কতগুলো ব্যক্তি, যারা এ মনোভাব জানে ও উপভোগ করে এবং একই লক্ষ্যের জন্য সমবেতভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।' সমাজ বিশেষ কতগুলো সম্পর্ক ও রীতিনীতির বন্ধনে আবদ্ধ। সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট বলেন, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল, 'যে সম্পর্ক দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।" সমাজের ভিত্তি হল ঐক্য, সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধতা। এ সম্পর্ক সীমিত অথবা ব্যাপক উভয় অর্থে ব্যবহার করা যায়। সীমিত অর্থে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের কৃষক সমাজ, এদেশে যারা কৃষিকর্ম করে, একই ধরনের জীবন যাপন করে এবং যাদের কাজকর্মে কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও রীতি দেখা যায় তারা এ সমাজের অন্তর্গত। আবার ব্যাপক অর্থে আমরা বলতে পারি 'বিশ্ব যুব সমাজ' এতে বোঝাবে নির্দিষ্ট বয়সী পৃথিবীর সকল তরুণকে একই রকম বয়স বলে এদের মধ্যে মিল থাকে মন–মানসিকতা ও আচরণের।

পরিবেশ ও সমাজের সম্পর্ক : মানব সমাজ গড়ে ওঠে পরিবেশকে কেন্দ্র করে। তাই পরিবেশ ও সমাজের মাঝে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশ ও সমাজ একে অপরকে প্রভাবিত করে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানব জীবনকে লালিত পালিত ও বিকশিত করে তোলে। মানুষের জীবন ও সমাজের ওপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম।

আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের খাদ্যাভ্যাস, আচারব্যবহার, নিয়ম–কানুন, পোশাক–পরিচ্ছদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদিকে যেমন পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি জীবনের উৎসাহ উদ্দীপনা, আশা–আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, কর্মপ্রেরণা ও সাফল্য – সব কিছুই পরিবেশের দান। সেজন্য পরিবেশের তারতম্যে সমাজের রীতিনীতি ও আচার–ব্যবহার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেকোন সমাজ ব্যবস্থা সেখানকার পরিবেশের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ পরিবেশই একটি সমাজের নিয়ম কানুন, আইন, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষ যখন একই স্থানে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তখন তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কের মাঝেই একটি সমাজ সৃষ্টি হয়। সহজ, সুন্দর ও রুচিশীল সমাজ গঠনের তাগিদে মানুষ তার পরিবেশকে সুন্দর করতে চেষ্টা করে। উন্নত জীবন যাপনের জন্য ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, হাটবাজার তৈরি করে। শিক্ষার জন্য স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য মসজিদ, মন্দির, গির্জা তৈরি করে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করে। এভাবে মানব সমাজ বিজ্ঞান ও শিল্পগত কলাকৌশল ব্যবহার করে পরিবেশে পরিবর্তন এনেছে। মানুষ শহর, নগর, বন্দরেও কলকারখানা গড়ে তুলেছে। এভাবে গ্রামীণ সমাজ শহর সমাজে পরিণত হয়েছে। সমাজ ও পরিবেশ একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। পরিবেশে পরিবর্তন ঘটলে সমাজে পরিবর্তন ঘটে, আবার সমাজের পরিবর্তন পরিবেশে পরিবর্তন আনে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশের কথা উল্লেখ করতে পারি। যেমন, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন আসে। এ পরিবর্তনের ফলে দেশের রাস্তাঘাট, শহর বন্দর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিরও পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে বাংলাদেশের পরিবেশও আমূল বদলে গেছে। বর্তমানে পরিবর্তিত ও উন্নত পরিবেশে বাংলাদেশের সমাজে উন্নতি ঘটছে। আমরা বলতে পারি, উন্নত পরিবেশ মানুষের চাহিদা অনুসারে জীবন গঠনে সহায়তা করে। আবার সমাজ জীবনের বিভিন্ন উপাদান যেমন সাংস্কৃতিক ও কৃষি শিল্পগত কৌশল পরিবেশকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে।

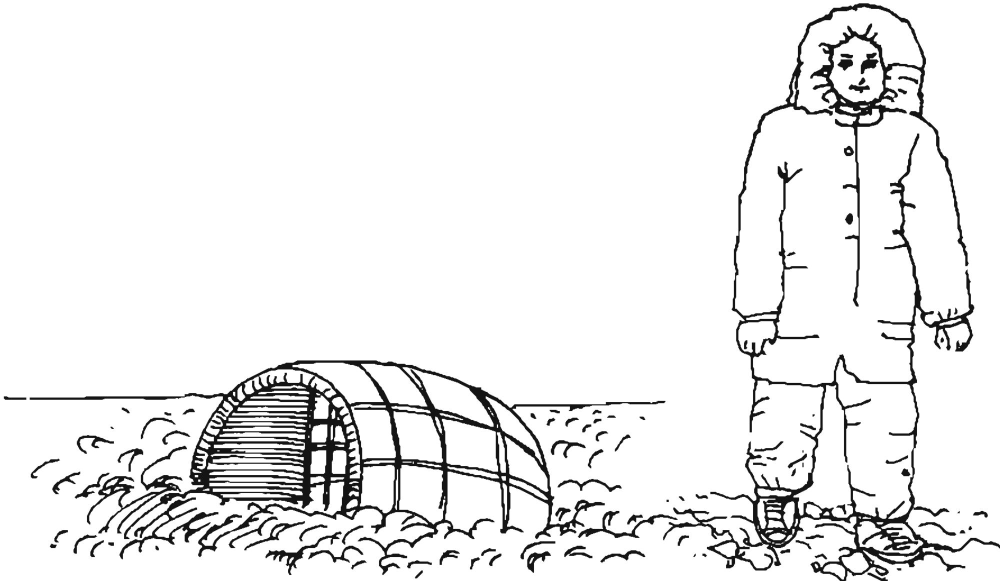
বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্নতা

মানুষের জীবন কী পরিবেশে গড়ে ওঠে তা জানতে হলে পরিবেশের সাথে কী কী উপাদান জড়িত তা জানা দরকার। আগেই বলা হয়েছে সাধারণত পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। আমাদের চারপাশের ভূপ্রকৃতি, নদনদী, জলবায়ু, উদ্ভিদ, প্রাণী খনিজ সম্পদ নিয়ে যে পরিবেশ গঠিত তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভৌগোলিক পরিবেশও বলা হয়।

আর সামাজিক পরিবেশের উপাদানের মধ্যে রয়েছে মানুষের আচার ব্যবহার, জাতি, ধর্ম, শিক্ষা–ভাষা, সংস্কৃতি, সরকার, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ সবকিছু মিলে যে পরিবেশ সৃস্টি হয়, তাকে বলা হয় সামাজিক পরিবেশ। ভৌগোলিক পরিবেশ প্রকৃতির সৃস্টি। কিন্তু সামাজিক পরিবেশ মানুষের তৈরী। ভৌগোলিক পরিবেশ তার দৈহিক গড়নকে সহায়তা করে। আর সামাজিক পরিবেশ তার সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে।

মানুষের জীবনযাত্রার সাথে পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। প্রত্যেক মানবগোষ্ঠির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–সামাজিক প্রথা, অভ্যাস, ভাষা, ধর্ম–আদর্শ ইত্যাদি। দেখা গেছে যে, ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা বা ভিন্ন বৈশিস্ট্যের পেছনে ভিন্ন পরিবেশের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কোনো স্থানের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর সে স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ যথেস্ট প্রভাব বিস্তার করে। কারণ ভূপৃষ্ঠের গঠন, জলবায়ু, নদনদী, উদ্ভিদ ও প্রাণী মানুষের জীবন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবেশের বৈচিত্র্য মানুষের পেশা, জনসংখ্যা এমনকি চরিত্রেও বৈচিত্র্য আনে। শীতপ্রধান দেশের লোক বেশি পরিশ্রমী ও কর্মঠ হয়। আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক কম পরিশ্রমী ও কর্মবিমুখ হয়। যেসব স্থানের জমি উর্বর, বৃষ্টিপাত নিয়মিত, ফসল উৎপাদন প্রচুর, ভূমি সমতল সেখানকার যাতায়াত সুবিধাজনক ও জীবনযাত্রা সহজ। সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা কৃষিভিত্তিক ও লোকবসতি ঘন। অন্যদিকে মরুভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়া প্রতিকূল। সেখানে বেশি গরম অথবা বেশি শীত। এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট দুর্গম, কৃষিযোগ্য ভূমি অপ্রতুল ও খাদ্যের অভাব। এক কথায় বলা যায় সেখানে জীবন ধারণ কস্টকর। তাই সেখানে লোকবসতি কম। মানুষেরা কঠোর পরিশ্রমী এবং সাধারণত পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে।

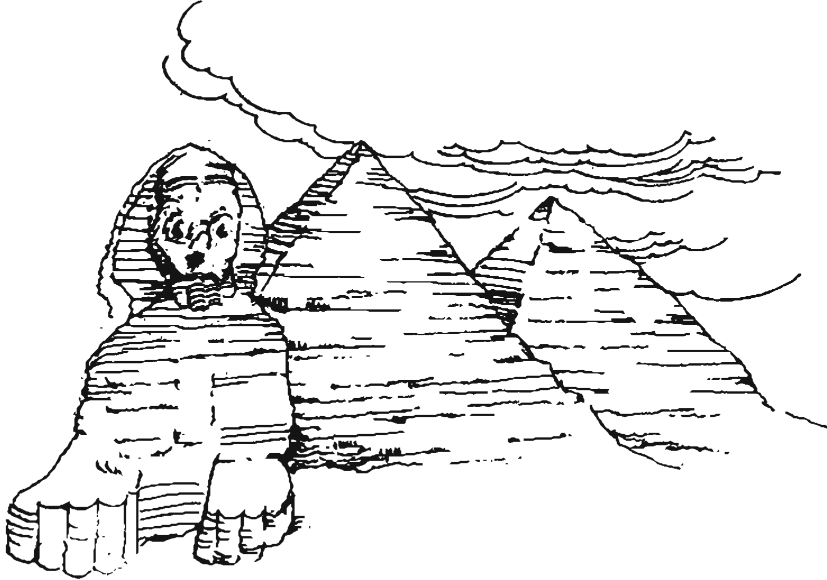
উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত। ভূপৃষ্ঠ সারাবছর বরফের আস্তরণে ঢাকা থাকে। এখানকার লোকেরা বরফের ঘর ইগলুতে বাস করে। এখানকার যাতায়াত দুর্গম। এরা পশু ও মাছ শিকার করে জীবন ধারণ করে। লোমশ পশুর চামড়া এদের পোশাক। লোকবসতি অতি বিরল।



চিত্র ১.১: ইগলু ও এস্কিমো

আবার নদী অববাহিকায় যেখানে উর্বর জমি রয়েছে সেখানে নৌ–যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল, ব্যবসা–বাণিজ্য সুবিধাজনক সেখানে শহর, নগর ও বন্দর গড়ে ওঠে। লোকবসতি ঘন হয়। সেখানকার লোক বাণিজ্য উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাড়ি জমায়, ভিন্ন ভিন্ন দেশের পণ্য ও সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে। এখানে অকৃষি পেশায় নিয়োজিত ব্যবসা–বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে স্বল্প পরিসরে বহু লোক বসবাস করার ফলে শহর গড়ে ওঠে। শহরই সভ্যতার লীলাভূমি। এসব সমাজে অন্য সমাজের আচার–আচরণ ও শিক্ষা–সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে।

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতাই নদ–নদীর মহান অবদান। যেমন–সিন্ধু নদের অববাহিকায় প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা, নীল নদের তীরে মিসর সভ্যতা, পীত নদীর তীরে প্রাচীন চীন সভ্যতা, মধ্য এশিয়ায় তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মিসরের নীল নদের বন্যায় জমিতে পলি পড়ে জমি উর্বর হয়ে গড়ে উঠেছিল বলে মিসরকে নীল নদের দান বলা হয়। এভাবে পৃথিবীর প্রাচীনতম চারটি সভ্যতা নদী সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে সমাজ ব্যবস্থায় উন্নত সভ্যতার বিকাশ সাধন করেছিল। এ সভ্যতা নদীমাতৃক সভ্যতা বলে পরিচিত। বাংলাদেশ নদীমাতৃক বলে বাংলাদেশ সমাজেও নদীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।



চিত্র ১.২ : মিসরের পিরামিড

মানুষের তৈরী সামাজিক পরিবেশেও ভিন্নরূপ দেখা যায়। পল্লী বা গ্রামাঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থা কৃষিকেন্দ্রিক। অধিকাংশ লোকের পেশা কৃষিকাজ। কৃষিকাজে কিছু কিছু বৃত্তিভিত্তিক কুটির শিল্পও আছে। অন্যদিকে শহর বন্দরের জীবন ব্যবস্থা, ব্যবসা–বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রিক। শহরের পরিবেশ মানুষের পরিকল্পনা মোতাবেক গড়ে ওঠে। বড় বড় শিল্প–কলকারখানা স্থাপিত হয়। জীবন ব্যবস্থায় যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার বেশি। গ্রাম অপেক্ষা শহরের জনগণ অধিক কর্মমুখী ও কুশলী। গ্রামের মানুষ থেকে শহরের মানুষের আচার ব্যবহার, শিক্ষা–দীক্ষা, ভাষা, পোশাক, খাদ্য, অভ্যাস এমন কি পেশাও ভিন্ন। শহরের জীবন ঘড়ির কাঁটার নিয়মে চলে।

সমাজের আদি অবস্থায় বন্য জীবনে মানুষ প্রধানত শিকার করে ও ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করত। এ স্তরেও তারা দলবদ্ধভাবে বাস করত। শীত অঞ্চলে তারা পাহাড়ের গুহায় বাস করত। গরম অঞ্চলে গাছের ডালে আশ্রয় নিত। এ সময় তারা আগুন ও লোহার ব্যবহার জানত না। পাথর বা হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করত। তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। স্থায়ী আবাসস্থল ছিল না। ধীরে ধীরে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখে। তারপর মৃৎপাত্র তৈরি করে ও তখন মৃৎশিল্পের প্রচলন শুরু হয়। তারা লোহা ব্যবহার করতে শেখে। পশুপালন ও চাষাবাদ প্রথা আবিষ্কার হয়।

কোনো কোনো স্থানে স্থায়ী আবাসস্থল গড়ে ওঠে। কর্মকুশলতা আরও বাড়ে। আদিবাসীরা গাছের বাকল বা চামড়ার পোশাক ব্যবহার করত। এখন তারা কাপড় তৈরি করতে শিখেছে। বন্য সমাজ ব্যবস্থা পালটে গিয়ে সভ্য সমাজের সূত্রপাত হয়। মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। সমাজের রীতিনীতি, চিন্তা-চেতনায়, বিশ্বাসে তার প্রতিফলন ঘটে। আদিম মানুষেরা প্রকৃতির শক্তি ও দুর্যোগকে কেন্দ্র করে তাদের ধর্ম বিশ্বাস গড়ে তোলে। আধুনিক মানুষেরা বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে প্রকৃতির ওপর তাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনে।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা গ্রাম ও শহর উভয়কে কেন্দ্র করে গঠিত। গ্রামের রীতিনীতি, আচরণ, পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস শহর থেকে পৃথক। শিক্ষা-সংস্কৃতিও কিছুটা ভিন্ন। গ্রামের লোক অধিকাংশ কৃষিজীবী। শহরে চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধান।

মানব সমাজের বৈচিত্র্যের কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের জীবন ধারায়, আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, মণিপুরীরা প্রধান। তাদের ভাষা, পোশাক, খাদ্য, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যতা।

সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা : নিজের প্রয়োজনেই মানুষকে সমাজ গঠন করতে হয়। সমাজের মাঝে রয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন, ধর্ম, শিক্ষা ও আদর্শ। যে সমাজের মানুষ যত বেশি এসব নীতিমালা ও আদর্শ মেনে চলে, সে সমাজে অন্যায়, অবিচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা তত কম। সমাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে না চললে সমাজের শান্তি নষ্ট হয়। সমাজ মাত্রই গতিশীল। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যুগের চাহিদা অনুযায়ী সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পরিবেশ মানুষের মাঝে কী সৃষ্টি করে?

ক. দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের
খ. সফলতা ও ব্যর্থতার
গ. শৃঙ্খলা ও আশাআকাঙ্ক্ষার
ঘ. ধ্যানধারণা ও সুখশান্তির

২. সমাজ গড়ে ওঠার পেছনে কারণ হল–

i. দলগত জীবনের প্রয়োজনীয়তা
ii. প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহে সহযোগিতা
iii. মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ সাধন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিশাল চাকমা রাঙামাটিতে বাস করে। তার চাচাতো ভাই রবিন শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে কানাডায় আছে। সে সেখানকার আবহাওয়া, পরিবেশ, সংস্কৃতি, জীবনধারা সম্পর্কে মাঝে মধ্যে বিশাল চাকমাকে পত্র লিখে জানায়। তাতে সে বুঝতে পারে কানাডায় শীতে তুষারপাত হয়। তাদের পাহাড়ি জীবনধারার কিছু কিছু মিলও পাওয়া যায়।

৩. রাঙামাটির আবহাওয়া জীবনধারণের জন্য–

ক. অনুকূল খ. প্রতিকূল

গ. বিরূপ ঘ. স্বাভাবিক

৪. কানাডা জলবায়ুর দিক থেকে কী ধরনের অঞ্চল?

ক. শীতপ্রধান খ. গ্রীষ্ম প্রধান

গ. চরমভাবাপন্ন ঘ. সমভাবাপন্ন

৫. কানাডার সঙ্গে রাঙামাটির যে দিক থেকে মিল লক্ষ্য করা যায়–

i. জনগোষ্ঠী বেশি পরিশ্রমী

ii. আবহাওয়া জীবনযাত্রার পক্ষে প্রতিকূল

iii. জনসংখ্যার ঘনত্ব কম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সমাজ সংসারের দায়িত্ব ও ঝামেলা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তি জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল। হঠাৎ একদিন দেখল একটি ইঁদুর তার কম্বলটি কেটে ফেলেছে। সে তখন গ্রামে গিয়ে একটি বিড়াল নিয়ে এল। পরে বিড়ালকে দুধ খাওয়ানোর জন্য একটি গাভী নিয়ে এল। ক্রমে গাভীর দেখাশোনার জন্য তার ছোট ভাইকে নিয়ে এল। এক পর্যায়ে তিনি বিয়ে করলেন। ঘরে ছেলে–মেয়ে জন্ম নিল। ক্রমশ সেখানে তার পরিবার এবং পরবর্তীতে একটা সমাজ সৃষ্টি হল। আসলে এভাবেই মানব সভ্যতা বিকশিত হয়েছে।

ক. সমাজ কী?

খ. লোকটি বারবার গ্রামে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন কিছু নিয়ে এসেছিল কেন?

গ. লোকটির কর্মকাণ্ডের আলোকে সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মানব সভ্যতার বিকাশে সমাজ গঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২. আদিল ও নোমান দুই বন্ধু। আদিলের বাবা–মা দু'জনেই শিক্ষক এবং তাঁরা ছেলের লেখাপড়া, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য সব বিষয়ে খুব খেয়াল করেন। নোমানের বাবা একজন ব্যস্ত ব্যবসায়ী এবং মা গৃহিনী। নোমানের বাবা ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত থাকায় সবসময় ছেলের লেখাপড়ার খোঁজ খবর নিতে পারেন না। নোমান স্কুলে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে এমনকি স্কুলে গেলেও লেখাপড়ায় অমনোযোগী। এজন্য তাকে প্রায়ই শিক্ষকদের ভর্ৎসনা শুনতে হয়।

ক. পরিবেশ কাকে বলে?

খ. পরিবেশ ও সমাজের সম্পর্ক বর্ণনা কর।

গ. আদিল ও নোমানের জীবন ভিন্নমুখী হওয়ার কারণ কী? ব্যাখা কর।

ঘ. সমাজ পরিবর্তন কীভাবে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায় তা বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবার

পরিবারের গঠন ও প্রকারভেদ : পরিবার সর্বাপেক্ষা আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তবে পরিবারের উৎস সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। যেমন, কেউ কেউ বলেন, পরিবার মানব সমাজে পূর্ব থেকেই ছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন, পরিবার মানব সমাজে কতগুলো ধাপ অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। যেভাবেই পরিবারের সৃষ্টি হোক না কেন পরিবার সর্বযুগে ও সর্বস্থানে মানবসমাজের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সমাজ জীবনে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা বহুমুখী। পরিবার একটি চিরস্থায়ী সামাজিক সংগঠন। পরিবার থেকে মানব জাতির বিকাশ লাভ ঘটেছে এবং তার সাথে সমাজেরও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

পরিবার বলতে আমরা কী বুঝি? সমাজ স্বীকৃত বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে যখন এক জন পুরুষ ও এক জন মহিলা যৌথভাবে বসবাস করার অধিকার লাভ করে, তখনই পরিবার গঠিত হয়। সেখানে সন্তান সন্ততি থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। তবে সন্তান জন্ম হওয়ার পর তারা রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে পরস্পর আবদ্ধ হয়। রক্তের সম্পর্কই পরিবারের মূল ভিত্তি এবং ঐক্যসূত্র। পরিবারের সদস্যরা একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িত।

বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষের মাঝে স্থায়ী সম্পর্কের সৃষ্টি হয় ও একত্রে বসবাস করে। একই অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে পরিবার প্রতিপালন এবং একই পরিচয়ে বংশানুক্রমে পরিবারের বিকাশ লাভ হল পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পরিবারের প্রকারভেদ : পরিবারকে নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যেমন

১। বিবাহ ধরনের ভিত্তিতে বর্তমানে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) একপত্নীক পরিবার : যে কোনো এক জন পুরুষ কেবলমাত্র এক জন স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুই জনে যৌথভাবে বসবাস করে, সে পরিবারকে একপত্নীক পরিবার বলে।

(খ) বহুপত্নীক পরিবার : বহুপত্নীক পরিবার বলতে সে পরিবারকে বোঝায় যেখানে এক জন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে।

২। অভিভাবকত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী পরিবারকে দুইভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) মাতৃপ্রধান পরিবার : যে পরিবারের সন্তানেরা মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হয় সে পরিবার মাতৃপ্রধান পরিবার। এ ধরনের পরিবারের অভিভাবক বা কর্ত্রী মা। পরিবারের সদস্যরা মায়ের নির্দেশে চলে। প্রাচীনকালে এ ধরনের পরিবার প্রথা ছিল। এখনও দক্ষিণ ভারত এবং আমাদের দেশে খাসিয়া ও গারো নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠীর মাঝে মাতৃপ্রধান পরিবার প্রচলিত আছে।

(খ) পিতৃপ্রধান পরিবার : যে পরিবারের সন্তানেরা পিতার পরিচয়ে পরিচিত এবং পরিবারে পিতাই একমাত্র অভিভাবক বা কর্তা, সে পরিবারকে বলা হয় পিতৃপ্রধান পরিবার। এরকম পরিবারের ভরণ পোষণ এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব পিতার ওপর ন্যস্ত থাকে। পরিবারের সবাই পিতার নির্দেশ মেনে চলে। বাংলাদেশে পিতৃপ্রধান পরিবারই প্রধান।

৩। আধুনিক পরিবারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) একক পরিবার : স্বামী–স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে একক পরিবার গঠিত হয়। সন্তান উপযুক্ত হলে বিয়ে করে আলাদা পরিবার গঠন করে। তখন আরেকটি নতুন একক পরিবার হয়। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে একক পরিবারের সংখ্যা বেশি।



চিত্র ১.৩ : একক পরিবার

(খ) যৌথ পরিবার : যে পরিবার মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে একত্রে বসবাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে। এক জন বয়স্ক ব্যক্তি যৌথ পরিবারের অভিভাবক হিসেবে গণ্য হন। তিনি পরিবার প্রতিপালন, সবার সুযোগ–সুবিধা, শিক্ষা–দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিবারের সবাই তার নির্দেশ মেনে চলে। সাধারণত কৃষিভিত্তিক সমাজে এবং আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবার দেখা যায়। আধুনিককালে যৌথ পরিবার ভাঙতে শুরু করেছে এবং একক পরিবারের প্রাধান্য বেড়ে যাচ্ছে।



চিত্র ১.৪ : যৌথ পরিবার

পরিবারের কার্যাবলি : মানুষ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই জীবন অতিবাহিত করে। এজন্য সমাজ জীবনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের রূপ বদলে গেলেও পরিবার কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য পালন করে থাকে। নিচে পরিবারের প্রধান প্রধান কাজগুলো বর্ণনা করা হল।

(১) **জৈবিক কাজ :** স্বাভাবিক কারণে পুরুষ ও নারী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করে সন্তানের জন্ম দেয় এবং তাদের লালন পালন করে। এভাবে বংশবৃদ্ধি হয়। এটা পরিবারের জৈবিক কাজ।

(২) **শিক্ষামূলক কাজ :** পরিবার হচ্ছে শিশু সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র। একটি পরিবারে শিশু বড় হয়, তার মা–বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভালবাসা পেয়ে। ছোটকাল থেকে সে তাদের ভাষা, চলাফেরা ও নিয়ম কানুন শেখে এবং তা তার অন্তরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। আদব কায়দা, নম্রতা, দয়ামায়া, ভালবাসা, এমন কি সাধারণ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাও শিশুরা পরিবার থেকে লাভ করে থাকে।

(৩) **অর্থনৈতিক কাজ :** পূর্বে পরিবারই ছিল উৎপাদনের একমাত্র কেন্দ্রস্থল। পরিবার সম্পত্তির মালিক ও নিয়ন্ত্রক ছিল। পরিবারের পুরুষদের যৌথভাবে উপার্জিত অর্থ পরিবারের ভরণ–পোষণের জন্য ব্যয় হত এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ পরিবারের মধ্যেই সম্পন্ন হত। এখনও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গোড়াপত্তন পরিবারের মধ্যেই হয়ে থাকে। পরিবারের সম্পত্তি ও নির্দিষ্ট পারিবারিক পেশার ওপর পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে। তবে বর্তমানে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে নানারকম কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করার ফলে পরিবারের অধিকাংশ অর্থনৈতিক কাজ পরিবারের বাইরে চলে গেছে। ফলে পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

(৪) **রাজনৈতিক কাজ :** পরিবারের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং অভিভাবকের নির্দেশ মান্য করার শিক্ষা পরিবারের সদস্যগণ প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে। অধিকন্তু পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা পরামর্শ করা এবং প্রত্যেক সদস্য পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা, সহনশীলতা ও সেবার মনোভাব বজায় রাখার শিক্ষাও প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবার থেকেই লাভ করে থাকে। এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। এছাড়া এক জন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের শিক্ষাও পরিবার থেকেই দেওয়া হয়। এসব গুণাবলি পরিবারের এক জন সদস্যকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(৫) **মনস্তাত্ত্বিক কাজ :** পরিবারের সদস্যদের লালন পালনের মধ্য দিয়ে পিতামাতা বা অভিভাবক সামাজিক চেতনা সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করেন। পরিবার তার সদস্যদের যত্ন দ্বারা শারীরিক ও মানসিক বিকাশ লাভে সহায়তা করে। এতে তাদের মাঝে দয়ামায়া, সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক গুণের সঞ্চার হয়। এই মানবিক গুণগুলোই পরবর্তীকালে সামাজিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটায়।

(৬) **বিনোদনমূলক কাজ :** পরিবারের সদস্যদের মাঝে আমোদ–প্রমোদের ব্যবস্থা করা পরিবারের অন্যতম দায়িত্ব। পরিবারের সদস্যগণ অবসর সময়ে বিভিন্ন রকম খেলাধুলা, বনভোজন, উৎসব পালন, সবাই মিলে গল্পগুজব করা রেডিও শুনা ও টেলিভিশন দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এতে পরস্পরের সাথে সম্পর্কের নিবিড়তা বাড়ে এবং পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

(৭) **ধর্মীয় কাজ :** পরিবার থেকেই পরিবারের শিশুরা ধর্ম সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে। পরিবারের বয়স্ক

সদস্যদের কাছে তারা ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান ও নিয়মকানুন পালন করতে শেখে। পরিবারেই তারা তাদের ধর্মশিক্ষা লাভ করে ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকে।

(৮) **সামাজিকীকরণ :** পরিবার সামাজিকীকরণে তার সদস্যের জ্ঞান দান করে থাকে। সমাজের এক জন সদস্য হিসেবে কী করণীয়, সামাজিক আচার–ব্যবহার, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, ধর্ম ও সংস্কৃতি কীভাবে পালন করতে হয় এসব সামাজিক শিক্ষা পরিবার থেকে গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পরিবারের মূল ভিত্তি এবং ঐক্যসূত্র কী?

ক. রক্তের সম্পর্ক
খ. বৈবাহিক সম্পর্ক
গ. প্রথাগত সম্পর্ক
ঘ. আত্মীয়তার সম্পর্ক

২. পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে–

i. একই অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে পরিবার প্রতিপালন
ii. একই পরিচয়ে বংশানুক্রমে বিকাশ
iii. নারী পুরুষের মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩–৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাসেল তার বাবা–মা, দাদা–দাদী, চাচাসহ একটি পরিবারে বাস করে। সেখানে তার চাচা বাজার করে, সে দাদীর কাছে আরবি পড়ে, দাদার সঙ্গে বিকালে বেড়াতে যায়, আর সন্ধ্যে হলেই মায়ের কাছে পড়তে বসে। সেখানে সে বড়দের সম্মান করে এবং ছোটদের আদর করে।

৩. রাসেলের পরিবার কী ধরনের পরিবার–

ক. একক পরিবার
খ. যৌথ পরিবার
গ. মাতৃপ্রধান পরিবার
ঘ. পিতৃপ্রধান পরিবার

৪. রাসেল তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে শিখে–

i. সামাজিক আচার–আচরণ
ii. ধর্মীয় আচার–আচরণ
iii. নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫. রাসেল তার পরিবারে যে নিয়ম শৃঙ্খলা ও অভিভাবকের নির্দেশ মান্য করে তা পরিবারের কোন ধরনের কাজ?

ক. শিক্ষামূলক
খ. ধর্মীয়
গ. রাজনৈতিক
ঘ. মনস্তাত্ত্বিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রহিম সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। সে তার বাবা–মার সঙ্গে ঢাকা শহরে বসবাস করে। তার বাবা একজন নামকরা ডাক্তার এবং মাও একজন শিক্ষিকা। বাবা–মা ছোট বেলা থেকেই রহিমের লেখাপড়ার ব্যাপারে বেশ যত্নশীল। এছাড়াও পরিবার এবং সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা, দায়–দায়িত্ব, ধর্মীয় বিধি বিধান, বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক গুণাবলী সম্পর্কে রহিমকে শিক্ষা দেন। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যদের বিনোদনের বিষয়টিও রহিমের বাবা খেয়াল রাখেন। একটি সুখী ও সুন্দর পরিবারে রহিম বেড়ে উঠছে।

ক. পরিবার কাকে বলে?
খ. রহিম যে পরিবারে বাস করে সেটি কোন ধরনের পরিবার? বর্ণনা কর।
গ. একটি আদর্শ পরিবারের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সুখী ও সুন্দর পরিবার সুনাগরিক তৈরি করে যুক্তি দেখাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতি

সামাজিক প্রথা

সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে কতকগুলো মৌলিক নিয়মকানুন বা বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। এ বিধি নিষেধগুলো আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। এগুলো সামাজিক আইন বা প্রথা। সমাজের নিত্যদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম, পারস্পরিক সামাজিক আচরণ ইত্যাদি যখন সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত বিধি হিসেবে গণ্য হয়, তখন এগুলোকে বলা হয় সামাজিক আইন বা প্রথা। প্রথাকে সামাজিক আচারও বলা হয়ে থাকে। প্রথা একসময় সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সুন্দর শোভন সামাজিক অভ্যাসগুলো প্রথা হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত অভ্যাস এবং প্রথা এক নয়। চা-পান, ধূমপান ইত্যাদি ব্যক্তিগত অভ্যাস, তবে তা প্রথা নয়। এগুলো পালনে সামাজিক বাধ্যবাধকতা নেই। অপরদিকে প্রথা ব্যক্তিগত বিষয় নয়। এর সাথে সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রথা পালনে কিছুটা সামাজিক বাধ্যবাধকতা আছে।

প্রথার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–প্রথা সমাজে সর্বদা বিদ্যমান। প্রথা সামাজিক আচরণ বিধি। প্রথায় মূল্যবোধের প্রতিফলন রয়েছে এবং প্রথা এক ধরনের সামাজিক অনুশাসন বা আইন। সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে সমাজের প্রচলিত প্রথা ব্যক্তি নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। সামাজিক প্রথা মেনে না চললে বা ভঙ্গ করলে অনেক সময় সামাজিক আইনে তার বিচার হয়, তাকে শাস্তিও দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে এখনও সামাজিক বিচারে শাস্তি হলে সমাজ তাকে 'একঘরে' করে রাখে। অর্থাৎ তার সাথে সামাজিক লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার রোগে-শোকে, বিপদে-আপদে, আচার-অনুষ্ঠানে কেউ তাকে সাহায্য করে না। সে সমাজ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করতে বাধ্য হয়। সে কোন সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানও পালন করতে পারে না। এটা এক ধরনের মানসিক শাস্তি।

সামাজিক প্রথা বা অনুশাসন সমাজে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন–গুরুজনকে সম্মান করতে হয়। পরস্পরের সাক্ষাতের সময় সালাম বা শুভেচ্ছা জানাতে হয়। এসব নিয়ম সব সমাজেই প্রচলিত আছে। সমাজের অন্যান্য সদস্য বা প্রতিবেশীর সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত বা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তা সামাজিক প্রথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক ও প্রতিবেশীর সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যমূলক মনোভাব বজায় রাখা একধরনের প্রথা।

ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এসব প্রথা ভিন্নতর হলেও মূলত এসব প্রথার একটি শাশ্বত রূপ আছে। প্রথা বা সামাজিক আইনের মাঝে সত্য ও সুন্দর বিরাজমান। তবে বিভিন্ন সমাজের আচার অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন। যেমন – বিবাহ অনুষ্ঠানাদি, নববর্ষ পালন বা স্বাধীনতা দিবস পালন ইত্যাদি ভিন্ন সমাজে ভিন্ন রকমভাবে পালন করা হয়। বাংলাদেশের সমাজের কতকগুলো প্রথা অন্যান্য দেশ থেকে কিছুটা ভিন্ন। যেমন–বিয়ের অনুষ্ঠান, অতিথি বা মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদি। অন্যান্য দেশের মানুষ বাংলাদেশের এসব সামাজিক আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়।

সামাজিক আইন বা প্রথা মেনে না চললে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সমাজ সুষ্ঠুভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না। যারা সামাজিক আইন-কানুন মেনে চলেন, তারা রাষ্ট্রীয় জীবনেও দেশের আইন-কানুন মেনে চলেন। সুতরাং সামাজিক প্রথা রাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। কোনো কোনো সামাজিক প্রথা আইন-আদালতেও প্রচলিত আছে। রাষ্ট্রীয় আদালতে এসব প্রথাকে অগ্রাহ্য করা হয় না। কোনো কোনো দেশে সামাজিক প্রথা রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়।

প্রচলিত রীতিনীতি বা লোকাচার

সামাজিক মানুষকে সমাজে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বসবাস করতে হলে কতকগুলো সামাজিক নীতি অনুসরণ করতে হয়। সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষ স্বাভাবিকভাবে এই রীতিনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। এসব রীতিনীতি সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক রীতিনীতি প্রত্যেক মানুষের জন্য একই মানদন্ডে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সামাজিক মানুষের বিশেষ রীতিনীতির রূপান্তরকেই লোকাচার বলে। সামাজিক প্রথা লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত।

লোকাচার সমাজের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বা গতিধারায় জন্ম লাভ করে। লোকাচার বা রীতিনীতি অনেক সময় অচেতনভাবে সৃষ্টি হয়। তবে লোকাচার সমাজে গতিশীল ভূমিকা পালন করে এবং সমাজের নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়। অর্থাৎ লোকাচার পরিবর্তনশীল। সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা সব সমাজের মানুষের সামাজিক জীবন কম বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়। সদ্ব্যবহার, আদব–কায়দা ইত্যাদি আচরণ বিধিও এসব রীতিনীতি বা লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন সমাজে এসব আচরণবিধিও বিভিন্ন। আবার সময়ের ব্যবধানে একই সমাজে এসব রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে। সমাজের মানুষের কোনটা করা উচিত বা কোনটা করা উচিত নয়, এটা সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজের মানুষের চরিত্র গঠনে এসব রীতিনীতি বিপুল শক্তি হিসেবে কাজ করে। এজন্য এসব রীতিনীতিকে অনেক সময় অবশ্য পালনীয় লোকরীতিও বলা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রথা কী?

ক. ব্যক্তিগত অভ্যাস খ. সামাজিক আচার
গ. মানসিক অবস্থা ঘ. মূল্যবোধের বিকাশ

২. লোকাচার গড়ে ওঠে–

i. সমাজের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়
ii. সামাজিক অসচেতনতায়
iii. সময়ের ঘাত প্রতিঘাত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩–৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিম এলাকায় ভাল ছেলে হিসেবে পরিচিত ঘরে বাইরে তার উপস্থিতি সবাইকে আনন্দ দেয়। কিন্তু তার চাচাতো ভাই ফাহিমকে কেউ পছন্দ করে না। তার অসহযোগিতামূলক মনোভাব সবাইকে কষ্ট দেয়। তার এ আচরণে তার মা–বাবাকে সামাজিকভাবে হেয় হতে হয়।

৩. রহিমের আচরণ নিয়ন্ত্রিত কেন?
   ক. সামাজিক অনুশাসন মেনে চলার কারণে
   খ. লোকাচারের প্রভাবে
   গ. প্রচলিত রীতিনীতির কারণে
   ঘ. বিধি নিষেধের ফলে

৪. ফাহিমের অসহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করে–
   i. সামাজিক বিশৃঙ্খলা
   ii. পারিবারিক অশান্তি
   iii. হতাশাগ্রস্ত মানসিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i
   খ. ii
   গ. i ও ii
   ঘ. i ও iii

৫. ফাহিমের বাবা–মাকে হেয় হতে হয়–
   ক. তার অসদাচরণের জন্যে
   খ. তার লেখাপড়ার অমনোযোগিতার জন্য
   গ. প্রতিবেশীদের সাহায্য করার জন্য
   ঘ. রহিমকে অনুসরণ করার জন্য

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সলিম তাঁর প্রতিবেশী বয়োজ্যেষ্ঠদের সালাম দেয়। পিতামাতার কথা মেনে চলে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন : বৈশাখী মেলা, বিয়ের অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে যোগদান করে।
   ক. সামাজিক প্রথা কী?
   খ. সলিম তার প্রতিবেশী বয়োজ্যেষ্ঠদের সালাম দেয় এবং পিতামাতার কথা মেনে চলে কেন?
   গ. সলিম তার প্রতিবেশী বয়োজ্যেষ্ঠদের সালাম না দিলে এবং পিতামাতার কথা না শুনলে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে?
   ঘ. সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি শৃঙ্খলা প্রক্রিয়ায় সহায়ক–মতামত দাও।

২. রহিমার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। সেখানকার সামাজিক নিয়মেই একদিন ঘটা করে তার বিয়ে হয়। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই যৌতুকের জন্য রহিমার উপর নেমে আসে স্বামী, শাশুড়ী ও ননদের সীমাহীন অত্যাচার। রহিমা তার বাপের বাড়িতে পালিয়ে আসে। শ্বশুর পক্ষের লোকজন রহিমার নামে নানা অপপ্রচার চালায়। এর ফলে গ্রামবাসীরা রহিমাদেরকে এক ঘরে করে রাখে।
   ক. যে সামাজিক নিয়মে রহিমার বিয়ে হয়েছিল তাকে কি বলা হয়।
   খ. রহিমার পরিবারকে একঘরে করে রাখার কারণটি ব্যাখ্যা কর।
   গ. রহিমার মত অবস্থা তোমার হলে তুমি কী করতে বুঝিয়ে লিখ।
   ঘ. রহিমার আলোকে সামাজিক প্রথার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম

মানব সমাজে ধর্মের প্রভাব

ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণ বা পোষণ করা। সুতরাং বলা চলে, মানুষ সাধারণভাবে নিজের ও অন্যের কল্যাণের জন্য যা ধারণ করে তাই ধর্ম। পরজগৎ ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ধর্মের প্রথম ও প্রধান দিক। ধর্ম মানুষকে সামাজিক শান্তি প্রদান করে তাকে অকল্যাণ ও যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করে। ধর্ম মানুষকে অন্যায়, অবিচার বা অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। পাপ–পুণ্যের বিবেচনা আছে বলেই এখনও মানুষ অনেক অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে। যেমন– ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, খ্রিস্টধর্ম। প্রত্যেক ধর্মেই কিছু নিয়মকানুন ও অনুশাসন থাকে। এই নিয়মকানুন ঐসব ধর্মের লোকদের পালন করতে হয়। প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু পবিত্র স্থান আছে। প্রত্যেক ধর্মেরই উপাসনালয় থাকে। যেমন–ইসলাম ধর্মের জন্য রয়েছে মসজিদ, হিন্দুধর্মের জন্য মন্দির, খ্রিস্টধর্মের জন্য গির্জা, বৌদ্ধধর্মের জন্য বৌদ্ধ মন্দির বা কিয়াং।

ধর্মের ওপর ভিত্তি করে অনেক সামাজিক আচার আচরণ গড়ে ওঠে। একই ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। ধর্ম সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করে। ধর্মের কারণে সামাজিক প্রথাগুলোও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একই সমাজের লোকজনদের সমাবেশ ঘটে, তাদের মধ্যে কথাবার্তা, পরিচয় ও কুশলাদি বিনিময় হয়। এতে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মুসলমানগণ নামাযের জন্য মসজিদে সমবেত হন। ঈদে তারা ঈদগাহে মিলিত হন। মুসলমানদের এই জমায়েত তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন, ঐক্য, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বকে আরও ঘনিষ্ঠ করে। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা, বৌদ্ধদের বৌদ্ধ পূর্ণিমা এবং খ্রিস্টানদের বড়দিন তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন ও বন্ধুত্ব আরও নিবিড় করে তোলে। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একে অন্যকে জানতে পারেন, একে অন্যের খোঁজখবর নিতে পারেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন। এতে সামাজিক সম্প্রীতিও বাড়ে। এভাবে ধর্ম সমাজ জীবনকে সুসংহত করতে প্রভাবিত করে। অতএব সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব অপরিসীম।

সামাজিক ঐক্য ও মানুষের সাথে মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ বা ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক সৃষ্টিতে ধর্ম বিশেষভাবে সহায়তা করে। ধর্মীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে তোলে। অতীতকাল থেকেই ধর্মের এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ধর্ম মানুষের জীবনযাপনের অন্যতম অঙ্গে পরিণত হয়েছে। ধর্ম মানুষকে দিয়েছে সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সম্প্রীতি।

ধর্ম মানুষের মনের স্বাভাবিক নীতিবোধকে উদ্দীপ্ত করে। ধর্ম মানুষকে বিনয়ী করে তোলে। সৎকর্ম, সদাচার, পূণ্যকর্ম এবং কর্তব্য কর্মের পথে তাকে ধরে রাখে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও নিয়মকানুন পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ কল্যাণের পথে এগিয়ে যায়।

ধর্ম মানুষকে মানবতা ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। ধর্মের অপব্যবহার করে অনেক সময়ে সংঘাত সৃষ্টি করা হয়। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ রয়েছে। কোনো ধর্মই মানুষে মানুষে হানাহানি সমর্থন করে না। অপরের ধর্ম ও ধর্মাচারের প্রতি

শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা পোষণ করাই সকল ধর্মের মূল কথা।

ইসলাম-ধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম -এ প্রধান চারটি ধর্ম সুদূর অতীত থেকে পৃথিবীর মানুষ ও সভ্যতাকে আলোকিত করে এসেছে। এর সবগুলোরই প্রচার ও প্রসার প্রথম ঘটেছে এশিয়া মহাদেশে।

প্রধান চার ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইসলাম ধর্ম

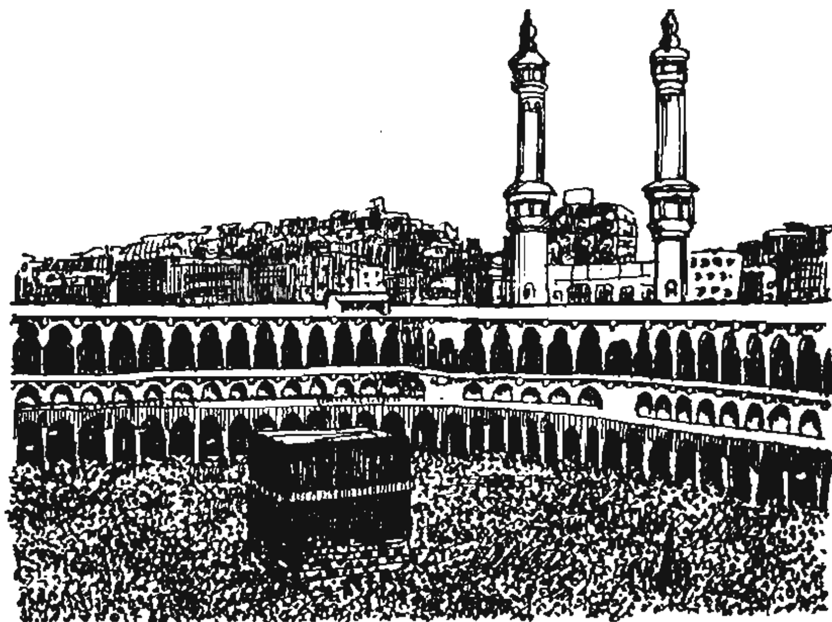
ইসলাম ধর্মের মতে, দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) আল্লাহ্র প্রথম নবী। তাঁর থেকে শুরু করে হযরত মুহম্মদ (স) পর্যন্ত যত নবী ও রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন সকলেই ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর বিধানে নবী ও রাসূলদের ধারাবাহিকতায় হযরত মুহম্মদ (স) শেষ নবী ও রাসূল। হযরত মুহম্মদ (স) প্রচারিত ইসলাম দুনিয়ার শেষ ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পবিত্র কুরআন শেষ ধর্মগ্রন্থ। ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতা বলতে আল্লাহর আদেশ নিষেধের পরিপূর্ণতাকেই বোঝায়।

ইসলাম ধর্মের শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরব দেশের মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ। হযরত মুহম্মদ (স)-এর জন্মের আগেই তিনি মারা যান। হযরত মুহম্মদ (স)-এর ছয় বছর বয়সে মাতা আমিনা পরলোকগমন করেন। পিতামাতাহীন মুহম্মদ (স)-কে প্রথম তাঁর দাদা আবদুল মোতালেব ও পরে তাঁর চাচা আবু তালেব লালন পালন করেন।

ছোটবেলা থেকেই মুহম্মদ (স) ছিলেন সত্যবাদী ও মধুর স্বভাবের। সত্যবাদিতার জন্য আরবের লোকেরা তাঁকে আল আমিন বা বিশ্বাসী বলে ডাকত।

আরব দেশের লোকেরা সে সময়ে নানা রকমের অন্যায় কাজ করত। তারা পৌত্তলিকতা, হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি, জুয়া খেলা, মদ খাওয়া, ব্যাভিচার, শিশু হত্যা প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকত। এ যুগকে বলা হয় 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের যুগ। দেশের লোকজনকে কীভাবে এ অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত করা যায় হযরত মুহম্মদ (স) তা নিয়ে চিন্তা করতেন। তিনি মাঝে মাঝে হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন বা নবী হন। তিনি ফেরেশতা জিবরাইল (আ) মারফত আল্লাহর ওহী পেতেন এবং সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন। ওহীর অর্থ প্রত্যাদেশ। আল্লাহর প্রেরিত এসব ওহীর সমষ্টিই পবিত্র কুরআন শরীফ। পবিত্র কুরআন শরীফ আরবি ভাষায় লিখিত। এ পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ইসলামের পূর্বাপর সকল বিধি বর্ণিত আছে।

ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। এ ধর্মের মূল কথা হল আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময়। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই ও মুহম্মদ (স) তাঁর প্রেরিত রাসূল। জীবিত অবস্থায় সবারই বিশ্বাসে ও কর্মে আল্লাহ্র নির্দেশমত ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলা কর্তব্য। সকলকে পরকালে ইহজীবনের কর্মফল ভোগ করতে হবে। শেষ বিচারের দিনে সকলকে জীবিত হয়ে আল্লাহর কাছে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। ইসলাম ধর্মের মূল স্তম্ভ পাঁচটি, যথা-কালেমা, নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত।



চিত্র ২.১ : কাবা শরীফ

কাবা শরীফ

আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগে আরব দেশের লোকেরা পবিত্র কাবা ঘরে ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি রেখে পূজা করত। ইসলাম ধর্মের বিধানমতে, মানুষের তৈরী মিথ্যা দেবদেবীর পূজা নিষিদ্ধ। হযরত মুহম্মদ (স) দেবদেবীর পূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর উপাসনা করতে বলেন। এতে আরবের লোকেরা ভীষণ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়। হযরত মুহম্মদ (স) ও তাঁর শিষ্যদের ওপর তারা অত্যাচার শুরু করে দেয়। তারা মহানবীকে হত্যারও ষড়যন্ত্র করে। হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর আদেশে তখন একদিন মক্কা ছেড়ে মদীনাতে চলে যান।

ইতিহাসে এ ঘটনাকে হিজরত বলা হয়। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। এ বছর থেকে হিজরী সাল গণনা করা হয়। মদীনার লোকেরা হযরত মুহম্মদ (স)–কে আশ্রয় দেয় ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কার লোকেরা এরপর বহুবার মদীনা আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার জন্য তখন মুসলমানরা অস্ত্র ধারণ করে। ফলে মক্কাবাসীদের সঙ্গে মদীনার মুসলমানদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এগুলো বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। অবশেষে হযরত মুহম্মদ (স) ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা জয় করেন তিনি মক্কার লোকদের সব অপরাধ মাফ করে দেন। তখন সকলে তাঁর মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

মক্কা বিজয়ের দুইবছর পর হযরত মুহম্মদ (স) শেষবারের মত মদীনা থেকে মক্কায় হজ্ব করতে আসেন। আরাফাতের ময়দানে সমবেত লক্ষ লক্ষ মুসলমানের উদ্দেশ্যে তিনি বিদায় হজ্বে অতি মূল্যবান ভাষণ দেন। এর মাত্র তিন মাস পর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত মুহম্মদ (স)–এর বাণী ও আচার আচরণ সংকলন করা হয়েছে হাদিসে। তিনি ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পবিত্র জীবনাচারণ, হাদিস ও কুরআনের আদর্শ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম ধর্ম গড়ে উঠেছে।

মক্কা ও মদীনা মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান। কাবা শরীফ পবিত্র উপাসনালয়। মুসলমানদের উপাসনালয়ের নাম মসজিদ। ইসলাম আরব দেশ থেকে পৌত্তলিকতা ও অসামাজিক কার্যকলাপ দূর করে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছিল। তখন ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আরবরা নিজেদের মধ্যেকার হানাহানি ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে তাঁরা বহু দেশ জয় করে ইসলামের বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে তুর্কি বিজয়ের সময়। এ সময় থেকে তুর্কি শাসক শ্রেণী এদেশে ইসলামের ভাব–আদর্শ স্থাপনে ব্রতী হন। সে সময়ে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্মে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মধ্যযুগে ভারতবর্ষ ছিল মুসলমানদের শাসনাধীনে। এ সময়ে আবার অনেক আরববাসী ব্যবসা ও ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এদেশে আগমন করেন।

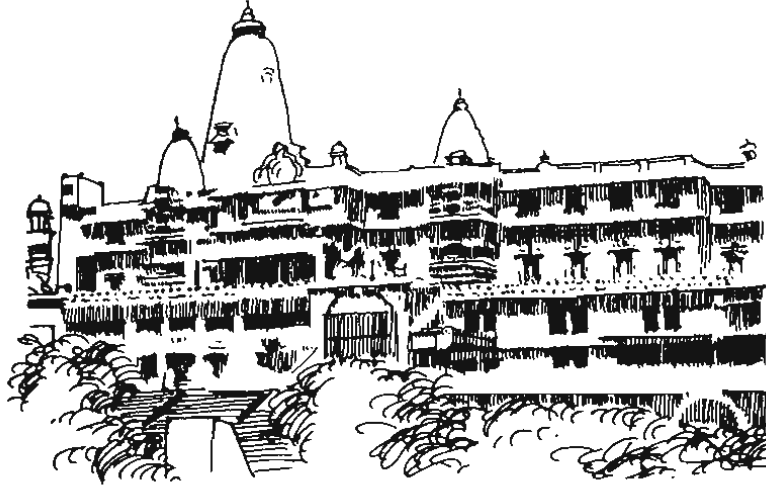
বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি। ১৯৯১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৬.৬ ভাগই মুসলমান। ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বেশি মুসলমান বাস করে।

হিন্দুধর্ম

মধ্য এশিয়া থেকে আর্যরা প্রাচীন ভারতে যে ধর্মীয় ভাবধারা নিয়ে এসেছিল, তা থেকেই হিন্দুধর্মের সৃষ্টি। হিন্দু শব্দটা ফারসি। হিন্দু নামটা বিদেশীদের দেয়া। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি এ ধর্মের প্রবর্তন করেননি। বহুকাল থেকে আজ পর্যন্ত এ ধর্ম চলে আসছে বলে একে 'সনাতন ধর্ম' বলা হয়।

বৈদিক যুগে হিন্দুরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন–সূর্য, বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতিকে দেবতা কল্পনা করে উপাসনা করত। সে সময় তাদের উপাসনা যাগযজ্ঞ, হোম প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল।

বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে নতুন নতুন দেবদেবীর সাকার পূজা পদ্ধতি চালু হয় এবং উদ্ভব হয় নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠানের। হিন্দুধর্মে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার দুই ধরনের উপাসনাই রয়েছে।



চিত্র ২.২. : মন্দির

কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্ম বিশ্বাসের প্রধান অঙ্গ। হিন্দুরা অবতারবাদেও বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে অধর্ম প্রবল হলে সৎধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান বিভিন্নরূপে পৃথিবীতে আসেন। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলের মূলকথা হচ্ছে মানুষ নিজের কর্মদোষে বা কর্মগুণে অনুন্নত বা উন্নত জীবন নিয়ে বারবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।

বর্ণ প্রথাও হিন্দুধর্মের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন হিন্দু সমাজে কেবলমাত্র চারটি বর্ণ ছিল প্রধান। যথা : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল ধর্মকর্ম ও পৌরহিত্য করা। ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল দেশ রক্ষা করা। বৈশ্যদের কাজ ছিল ব্যবসা–বাণিজ্য। আর শূদ্রদের কাজ ছিল কায়িক পরিশ্রম। হিন্দু সমাজে শূদ্রদের নিচুস্তরের বলে গণ্য করা হত। পরে এ চার বর্ণ ভেঙে নানা বর্ণের উদ্ভব হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব হিন্দুধর্মের এক জন বড় সংস্কারক। হিন্দুরা তাঁকে কলিযুগের অবতার হিসেবে শ্রদ্ধা করে। তিনি বৈষ্ণব ধর্মমত প্রচার করেন।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ হিন্দুদের প্রথম ধর্মগ্রন্থ। বেদের অন্য নাম শ্রুতি। বেদ চারটি ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। উপনিষদ, গীতা, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতকেও হিন্দুরা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সম্মান করে। তাদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, সীতাকুন্ড প্রভৃতি। হিন্দুদের উপাসনালয়কে মন্দির বলে। ভারত ও বাংলাদেশে অনেক বিখ্যাত মন্দির রয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা শতকরা ১২.১ ভাগ।

বৌদ্ধধর্ম

গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৫০০ মিলিয়নের বেশি লোক বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। আমাদের বাংলাদেশেও শতকরা ০.৩ ভাগ বৌদ্ধ রয়েছে।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের কপিলাবস্তু নগরে এক রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোধন, মাতার নাম মায়াদেবী। পিতামাতা তাঁর নাম রাখেন গৌতম। তিনি সিদ্ধার্থ নামেও পরিচিত ছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই গৌতম ছিলেন সংসারের প্রতি উদাসীন ও চিন্তাশীল। একদিন এক শব দেহ বয়ে নিচ্ছে দেখে তিনি চিন্তিত হলেন। তখন থেকে মানুষের জরা, দুঃখ ও মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে পীড়া দিত। সব সময়ই তিনি ভাবতেন কি করে এসবের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

পুত্রের এ উদাসীনতা দেখে রাজা শুদ্ধোধন তাঁকে যশোধরা বা গোপা দেবী নামে এক সুন্দরী রাজকন্যার সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের পর তিনি রাহুল নামে এক সন্তানের জনক হন। সংসারের প্রতি মায়া ক্রমেই বাড়ছে দেখে এক রাতে তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ বছর।

গৃহত্যাগের পর গৌতম ছয় বছর নির্জনে ধ্যানমগ্ন থেকে কঠোর সাধনা করেন। অবশেষে বুদ্ধগয়ার কাছে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে এক অশ্বথ গাছের তলায় বসে তিনি ধ্যানমগ্ন হন এবং বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেব প্রচার করেন যে, জীবনে আটটি উপায় অবলম্বন করলে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে। এ আটটি উপায় বা পথ হচ্ছে সৎ দৃষ্টি, সৎ সংকল্প, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ জীবিকা, সৎ চেষ্টা, সৎ স্মৃতি ও সৎ সমাধি।

বুদ্ধদেব যে ধর্ম প্রচার করেন তার নাম বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মে কোন জাতিভেদ নেই। এ ধর্মের মূলকথা হচ্ছে অহিংসা পরম ধর্ম। বুদ্ধদেব এছাড়াও মানুষকে পঞ্চশীল পালনের উপদেশ দিয়ে গেছেন।

পঞ্চ শব্দের অর্থ হচ্ছে পাঁচ এবং শীল শব্দের অর্থ হল আচরণ। এ পঞ্চশীল হচ্ছে জীবহত্যা না করা, চুরি না করা, মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা, মিথ্যা কামাচারে বশীভূত না হওয়া, মদ্যাসক্ত না হওয়া।

পালি ভাষায় রচিত ত্রিপিটক বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বুদ্ধগয়া ও সারনাথ তাদের পবিত্র তীর্থস্থান। বৌদ্ধদের উপাসনালয়কে বলা হয় বৌদ্ধ বিহার বা প্যাগোডা বা কিয়াং।



চিত্র ২.৩ : প্যাগোডা

গৌতম বুদ্ধ আশি বছর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৫ অব্দে কুশীনগরে পরিনির্বাণ লাভ করেন। মৌর্য সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে একে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেন। পরবর্তীকালে কুষাণ সম্রাট কণিস্কও এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করে একটি বিশ্বধর্মে পরিণত হয়। বর্তমানে শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এটি প্রধান ধর্ম হিসেবে পরিগণিত।

খ্রিস্টধর্ম

খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিস্ট। ১লা খ্রিস্টাব্দে তিনি প্যালেস্টাইনের বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম মেরী।

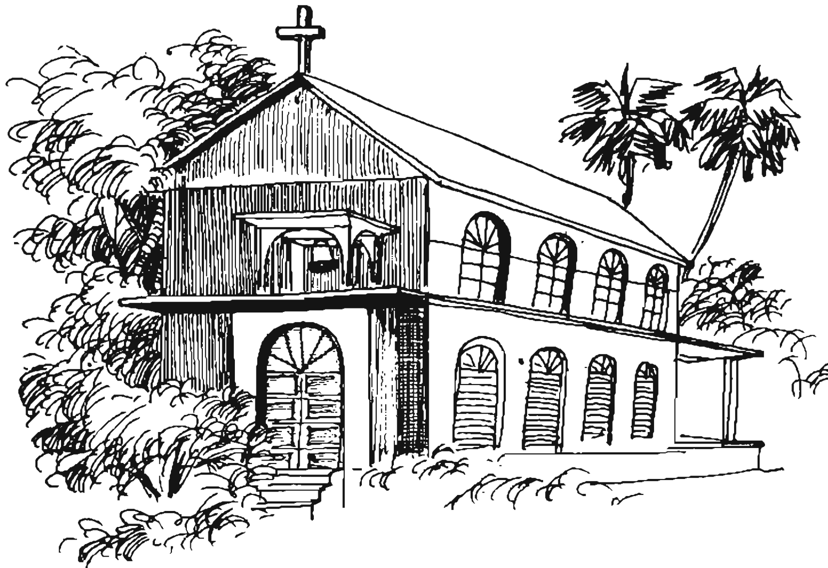
প্যালেস্টাইন সে সময় ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রদেশ। এর অধিবাসীরা ছিল ইহুদি। ইহুদিধর্ম তখন নানা অনাচারে ভরে গিয়েছিল।

প্রায় তিরিশ বছর নিরিবিলি জীবন যাপনের পর যীশু তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন। যীশুর ধর্ম অনুসরণকারীদের বলা হয় খ্রিস্টান। পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ১০০০ মিলিয়নেরও বেশি। আমাদের দেশে খ্রিস্টানের সংখ্যা শতকরা ০.৬ ভাগ।

যীশু তাঁর নিজস্ব ধর্মমত প্রচার শুরু করলে ইহুদিরা তাঁর ওপর ভীষণ ক্ষেপে যায়। তারা মানব প্রেমিক যীশুর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। রোম সম্রাট অগাস্টীন সীজারের প্রতিনিধি পন্টিয়াস পাইলেট তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মতে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যীশুরই এক শিষ্য জুডাস ইসকারিটি ঘুষের লোভে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

যীশু খ্রিস্ট সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরকে উপাসনা করা ও খারাপ কাজের জন্য অনুতাপ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এছাড়াও যীশু প্রচার করেছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের কথা। তাঁর ধর্মপ্রচারে মুগ্ধ হয়ে বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যমণ্ডলী বিভিন্ন দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। এ শিষ্যদের মধ্যে সেন্টপল ও সেন্ট পিটার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রাথমিক যুগে রোমের পৌত্তলিক শাসকদের হাতে খ্রিস্টানরা নানা অত্যাচার ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। পরে চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তী সম্রাট থিউডোসিয়াস একে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করেন। এ ধর্মের প্রভাবে তখন অনেক সামাজিক কুপ্রথার অবসান ঘটে।



চিত্র ২.৪ : গির্জা

খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেল। এটি হিব্রু ভাষায় রচিত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। খ্রিস্টানরা গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে। জেরুজালেম তাদের পবিত্র তীর্থস্থান ও জর্ডান তাদের পবিত্র নদী। রোমের ভ্যাটিকান শহরে খ্রিস্টান জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু পোপ বাস করেন।

যীশু খ্রিস্টের অনুসারীরা মনে করে যে, যীশু স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, ক্রুশবিদ্ধ করে যীশুকে হত্যা করা যায়নি। কবর থেকে জীবিত ওঠে এসে তিনি শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন।

মুসলমানরা যীশুকে বলেন হযরত ঈসা (আ) নবী এবং মাতা মেরীকে বলেন, বিবি মরিয়ম। বাইবেলকে মুসলমানরা ইনজিল কেতাব বলে থাকেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হিন্দু শব্দটি কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত?

ক. গ্রিক খ. ল্যাটিন

গ. ফরাসি ঘ. হিন্দি

২. খ্রিস্ট ধর্মের মূল কথা হল–

i. সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরকে পূজা করা

ii. খারাপ কাজের জন্য অনুতাপ করা

iii. মদ্যাসক্ত না হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

প্রদত্ত চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩. প্রদত্ত চিত্রটি কোন ধর্মের পবিত্রস্থান–

ক. হিন্দু খ. বৌদ্ধ

গ. খ্রিস্টান ঘ. ইসলাম

৪. এই ধর্ম ভারতের বাইরে যে সকল দেশে প্রধান ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়–

ক. মায়ানমার, তিব্বত, বাংলাদেশ খ. চীন, জাপান, কোরিয়া

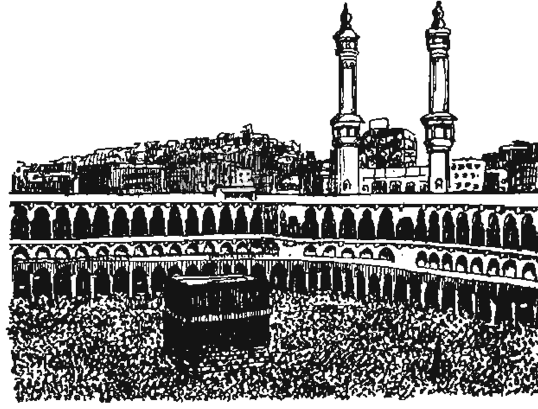
গ. মায়ানমার, জাপান, ইন্দোনেশিয়া ঘ. থাইল্যান্ড, তিব্বত, পাকিস্তান

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মাসুম মুসলিম পরিবারের সন্তান। তার পিতামাতা ধর্মপ্রাণ। তারা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেন। সবসময় সত্য কথা বলেন, নিয়মিত নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, যাকাত আদায় করেন। অন্য মানুষের কষ্ট বা ক্ষতি হতে পারে এমন কোন কাজ করেন না। তাদের ব্যবহার অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন ইসলাম শান্তির ধর্ম, সম্প্রীতির ধর্ম। এ ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানও বটে।

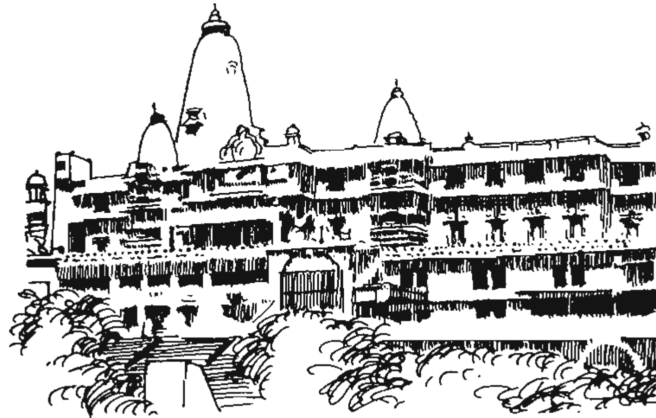
ক. ধর্ম কী?
খ. মাসুমের ধর্মের মূল কথাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. ইসলাম ধর্ম কীভাবে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধ আনতে পারে? ব্যাখা কর।
ঘ. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২. নিচের চিত্রটি মনোযোগ সহকারে দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



ক. প্রদত্ত চিত্র দ্বারা কোন ধর্মের পবিত্র স্থান নির্দেশ করে?
খ. এ পবিত্র স্থানটি কোন বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের কেন্দ্র বিন্দু তা ব্যাখ্যা কর।
গ. চিত্রে উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সামাজিক প্রভাব বর্ণনা কর।
ঘ. এ ধর্মটি আরব সমাজে আমুল পরিবর্তন সাধন করে, যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর।

৩. নিচের চিত্রটি একটি ধর্মীয় স্থাপনার। চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



ক. উপরের চিত্রটি কিসের?
খ. সনাতন ধর্ম বলতে কী বুঝ?
গ. সনাতন ধর্মের মূলবানীর সঙ্গে ইসলাম ধর্মের মূলবানীর পার্থক্য নির্দেশ কর।
ঘ. হিন্দুধর্মে বর্ণপ্রথার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশ

(১২০৬–১৭৫৭ সাল)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের আগমন

আরবদের সিন্ধু বিজয়

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে মুসলমানদের ভারত জয়ের কথা জেনেছ। এখানে আমরা এ সম্পর্কে আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো। তিন পর্যায়ে এ বিজয় সাধিত হয়। প্রথম পর্যায় ছিল আরবদের সিন্ধু বিজয়। তখন উমাইয়া বংশের আল–ওয়ালিদ ইসলাম জাহানের খলিফা। তিনি ৭০৫ থেকে ৭১৫ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতানের রাজা ছিলেন দাহির। আরব সাম্রাজ্য তার রাজ্যসীমার প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। নানা কারণে মুসলমানগণ রাজা দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করে এবং তা দখল করে নেয়।

আরবদের সিন্ধু অভিযানের কারণ

রাজনৈতিক কারণ : সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এ সকল রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্ব অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজ উপমহাদেশের রাজনৈতিক অনৈক্য ও দুর্বলতার কথা জানতেন। কাজেই তিনি উপমহাদেশ জয় করতে আগ্রহী হন।

দাহির কর্তৃক অপরাধীদের আশ্রয় দান : আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল থেকে কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী পালিয়ে এসে দাহিরের রাজ্যে আশ্রয় নেয়। এতে হাজ্জাজ দাহিরের ওপর রেগে যান।

সীমান্ত সংঘর্ষ : মুসলিম সাম্রাজ্য ও দাহিরের রাজ্য পাশাপাশি হওয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রায়ই সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটতোই। এর ফলে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়ে।

দেবল বন্দরে জলদস্যুদের দ্বারা আরব জাহাজ লুণ্ঠন : খলিফা ওয়ালিদ এবং ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজের নিকট সিংহলের (শ্রীলংকার) রাজা আটটি জাহাজ বোঝাই উপঢৌকন পাঠান। কিন্তু সিন্ধুর দেবল (বর্তমান করাচি) বন্দরে তা জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। এ জন্য হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু দাহির জলদস্যুদের অপরাধের দায়িত্ব নিতে ও ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানান।

সিন্ধু অভিযান : এ সকল কারণে হাজ্জাজ দাহিরের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান। কিন্তু পরপর দুইটি অভিযান ব্যর্থ হয়।

তারপর ৭১২ সালে হাজ্জাজ তৃতীয় অভিযান পাঠান। এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ বিন কাসিম। দাহির যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। তাঁর পত্নী রাণীবাঈ ও পুত্র জয়সিংহ রাওয়ার দুর্গে আশ্রয় নেন। মুহম্মদ বিন কাসিমের হাতে রাওয়ার দুর্গের পতন হলে রানী ও অন্তঃপুরের মহিলাগণ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেন। তারপর মুহম্মদ বিন কাসিম আলোর ও মুলতান দুর্গ জয় করেন। এভাবে দাহিরের সমস্ত রাজ্য মুসলমানদের দখলে চলে আসে। মুহম্মদ বিন কাসিম বিজিত অঞ্চলে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল : সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। যদিও দীর্ঘদিন মুসলমান বিজয় শুধু সিন্ধুতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও এ বিজয় পরবর্তীকালে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। এ বিজয়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল আরও ব্যাপক। সিন্ধু বিজয়ের ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে। পরবর্তীকালে স্থানীয় বহুলোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বহু আরব মুসলমান স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে বসবাস করতে থাকে। মুসলমানগণ ভারতীয় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চা করে ও সে সব শাস্ত্রের উন্নতি ঘটায়। এভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ লাভবান হয়।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রায় তিনশ বছর পর ভারতীয় উপমহাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানের নেতা ছিলেন গজনীর সুলতান মাহমুদ। পিতা সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর ৯৯৭ সালে তিনি গজনীর সুলতান হন। তিনি ছিলেন সুশাসক এবং সাহসী যোদ্ধা।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণ : সবুক্তগীনের শাসনামল থেকেই পাঞ্জাবের শাহী বংশীয় রাজপুত রাজা জয়পালের সাথে গজনীর বিরোধ চলে আসছিল। সুতরাং পাঞ্জাবের সাথে শত্রুতা সুলতান মাহমুদ উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। তাছাড়া ভারতে এ সময় কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। সারা ভারতবর্ষ ছিল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। এ সকল রাজ্যের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব ছিল না। প্রায় সবসময় রাজ্যগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। মাহমুদ ভারতীয় রাজ্যগুলোর এ কলহ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ ছিল ধন–সম্পদে ঐশ্বর্যশালী। ভারতের সম্পদ লুট করে গজনী রাজ্যকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সুলতান মাহমুদ। বারবার ভারত আক্রমণ করে তিনি সোনা–রূপা, হীরা–জহরৎ ইত্যাদি বহুমূল্যবান ধনরত্ন গজনী নিয়ে যান। সুলতান মাহমুদ সেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে বহু অর্থ ব্যয় করেন। জ্ঞানী–গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ধর্মীয় উন্মাদনার বশবর্তী হয়ে তিনি অভিযান পরিচালনা করেননি। তবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে তিনি ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

সুলতান মাহমুদের প্রধান প্রধান অভিযান : ১০০০ থেকে ১০২৭ সালের মধ্যে সুলতান মাহমুদ মোট ১৭বার ভারত আক্রমণ করেন। ১০০১ সালে তিনি পিতৃশত্রু জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হন। প্রচুর মুক্তিপণ দিয়ে তিনি উদ্ধার পান। কিন্তু বার বার পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে তিনি চিতার আগুনে আত্মাহুতি দেন।

১০০৮ সালে সুলতান মাহমুদ জয়পালের পুত্র উত্তরাধিকারীর আনন্দপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এ যুদ্ধে আনন্দপাল উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোর নিকট থেকে প্রচুর অর্থ ও সৈন্য সাহায্য পেয়েছিলেন। বর্তমান পেশোয়ার শহরের কাছে আনন্দপালের মিলিত বাহিনীর সাথে সুলতান মাহমুদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে আনন্দপালের জয় হলেও শেষ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদের রণদক্ষতার কাছে তাঁকে নতি স্বীকার করতে হয়। এ যুদ্ধের ফলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের ওপর সুলতান মাহমুদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০০৯ থেকে ১০১৪ সালের মধ্যে সুলতান মাহমুদ নগরকোট, মুলতান, আলোয়ার, কাশ্মীর ও থানেশ্বর আক্রমণ করে এ সকল অঞ্চল থেকে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে যান। ১০১৮ সালে তিনি ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ হিন্দুরাজ্য কনৌজ আক্রমণ করেন। কনৌজের রাজা রাজ্যপাল মাহমুদের অজেয় সৈন্যবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কনৌজ থেকে বিপুল পরিমাণ রত্ন সম্ভার নিয়ে মাহমুদ স্বদেশে ফিরে যায়। ১০২১ সালে সুলতান মাহমুদ চন্ডেলার রাজা গন্ডকে কালিগঞ্জের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১০২৬ সালে কাথিয়াওয়াড়ের সোমনাথ মন্দিরের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় মাহমুদের ষোড়শ অভিযান। ভারতের হিন্দু রাজারা মিলিতভাবে সোমনাথ মন্দির রক্ষার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। সোমনাথ অভিযান

থেকে মাহমুদ সবচেয়ে বেশি ধনরত্ন লাভ করেন। মাহমুদের শেষ অভিযান পরিচালিত হয় ১০২৭ সালে জাঠদের বিরুদ্ধে। ১০৩০ সালে সুলতান মাহমুদের মৃত্যু হয়।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল : ভারতে কোন স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর এতগুলো অভিযানের স্থায়ী ফল হিসেবে শুধু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবই গজনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করে পরবর্তী ভারত অভিযানের পথ সুগম হয়। সুলতান মাহমুদ ভারতকে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারেই দুর্বল করে ফেলেছিলেন। ফলে পরবর্তী মুসলিম বিজয় সহজ হয়েছিল। এ অভিযানের ফলে ভারতে মুসলিম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায়। সুলতান মাহমুদের সাথে অনেক পণ্ডিতও ভারতে এসেছিলেন। তারা ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। এ সকল পণ্ডিতদের মধ্যে আল বিরুনী ছিলেন অন্যতম।

মুহম্মদ ঘুরীর ভারত বিজয়

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর প্রায় দেড়শ বছর পর ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় পর্যায়ে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়। এ পর্যায়ে মুসলিম অভিযানের ফলেই ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সফল অভিযানের নেতা ছিলেন মুহম্মদ ঘুরী। তিনি অবশ্য ১১৯১ সালে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে দিল্লী ও আজমীর দখল করেন।

ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা : গজনী ফিরে যাওয়ার আগে মুহম্মদ ঘুরী তাঁর ক্রীতদাস ও বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে ভারতের অধিকৃত অঞ্চলগুলোর শাসনভার দিয়ে যান। কুতুবউদ্দিন দিল্লীতে শাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।

কনৌজ, বিহার ও বাংলা জয় : ১১৯৪ সালে মুহম্মদ ঘুরী আবার ভারতে আসেন। এবার তিনি কনৌজের রাজা জয়চাঁদকে আক্রমণ করেন। জয়চাঁদ পরাজিত হন। কনৌজ ও বারানসী মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। ১২০৩ সালে তাঁর বড় ভাই গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু হলে মুহম্মদ ঘুরী ঘুরের সিংহাসনে বসেন। তখন তিনি মুইজউদ্দিন উপাধি ধারণ করেন। কুতুবউদ্দিন তার অধীনে দিল্লীর শাসনকর্তা হিসেবে বহাল থাকেন। এ সময়ে আর এক মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী সমগ্র বিহার ও বাংলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন (১২০৪–০৫ সাল)। এভাবে বাংলা পর্যন্ত মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হয়। ১২০৬ সালে মুহম্মদ ঘুরী পাঞ্জাবের একটি বিদ্রোহ দমন করতে আসেন এবং রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার পথে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। মুহম্মদ ঘুরী ভারতে মুসলিম রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত সালে সুলতান মাহমুদের মৃত্যু হয়?

ক. ১৯১২ সালে খ. ১০৩০ সালে

গ. ১২১২ সালে ঘ. ১২৩০ সালে

২. মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সুদুর প্রসারী হয়–

i. রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে

ii. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

iii. বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

প্রদত্ত ছকের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শাসনকর্তা	অভিযান ও রাজ্যজয়
দাহির	সুলতান
হাজ্জাজ	কনৌজ
সুলতান মাহমুদ	কালিঞ্জর
মুহম্মদ ঘুরী	সোমনাথ
	আজমীর

৩. উপরে উল্লিখিত কোন শাসন কর্তা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে আজমীর দখল করেন?
ক. দাহির　　খ. হাজ্জাজ
গ. মুহাম্মদ ঘুরী　　ঘ. সুলতান মাহমুদ

৪. কোন অভিযান থেকে সুলতান মাহমুদ সবচেয়ে বেশি ধনরত্ন লাভ করেন?
ক. সুলতান　　খ. কনৌজ
গ. কালিঞ্জর　　ঘ. সোমনাথ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রামিসা ও মারিয়া মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছিল। রামিসা বললো "সুলতান মাহমুদ বেশ কয়েক বার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। ভারতে তাঁর স্থায়ীভাবে রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল না। মারিয়া বললো "মুহাম্মদ ঘুরী ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।"

ক. সুলতান মাহমুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন?
খ. আনন্দ পালের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদের পরিচালিত অভিযানের বর্ণনা দাও।
গ. মাহমুদের ভারত অভিযানের মূল প্রেরণা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মুহাম্মদ ঘুরী উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।' মারিয়ার উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তুর্কী, খলজী, তুঘলক,

সৈয়দ ও লোদী শাসন

প্রাথমিক যুগের তুর্কী শাসন

(১২০৬–১২৯০ সাল)

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর মুহম্মদ ঘুরী কুতুবউদ্দিন আইবেককে দিল্লির শাসক নিযুক্ত করে যান। তারপর ১২০৬ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় মুহম্মদ ঘুরী নিহত হলে কুতুবউদ্দিন স্বাধীন সুলতান হিসেবে দিল্লিতে শাসন কাজ শুরু করেন।

কুতুবউদ্দিন ছিলেন প্রথম জীবনে মুহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ইলতুতমিশ এবং বলবনও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। এজন্য এক সময় কুতুবউদ্দিন এবং তার উত্তরাধিকারীদের শাসনকালকে দাস বংশীয় শাসন বলা হত। কিন্তু এ সময়ের শাসকগণ দাস ছিলেন না। কেননা শাসনভার গ্রহণের পূর্বে তাঁরা দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। আবার তাঁরা সকলে একই বংশেরও লোক ছিলেন না। এ জন্য আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কুতুবউদ্দিন ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামলকে প্রাথমিক যুগের তুর্কী শাসন বলে চিহ্নিত করেন।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬–১২১০) : স্বাধীন সুলতান হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেকের শাসনকাল মাত্র চার বছর। তিনি যোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি এক জন বড় নির্মাতা ছিলেন। তিনি কুওত–উল–ইসলাম নামে দিল্লিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কুতুবমিনার নামক সুউচ্চ মিনারটির নির্মাণ কাজও তার শাসনামলে শুরু হয়। দিল্লির বিখ্যাত সুফী কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির নামানুসারে এর নাম রাখা হয় কুতুবমিনার। কুতুবউদ্দিন অত্যন্ত দানশীল সুলতান ছিলেন। দানশীলতার জন্য তাকে লাখবখস বলা হত। চৌঘান খেলার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয় (১২১০ সাল)।

সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুতমিশ (১২১১–১২৩৬) : কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর অভিজাতগণ আরাম শাহকে সিংহাসনে বসান। আরাম শাহ ছিলেন অযোগ্য ও দুর্বল প্রকৃতির। ফলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুতরাং এক বছরের মধ্যেই তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে অভিজাতগণ কুতুবউদ্দিনের জামাতা ইলতুতমিশকে দিল্লির সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন। প্রথম জীবনে তিনি কুতুবউদ্দিনের ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু যোগ্যতার জন্য কুতুবউদ্দিন তাঁকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করেন এবং তার সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দেন।

ইলতুতমিশ ছিলেন প্রাথমিক যুগের তুর্কী সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর শাসনকালে পশ্চিমে সিন্ধু ও পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত সুলতানী শাসন বিস্তৃতি লাভ করেন। অবাধ্য হিন্দু রাজা ও উদ্যত আমীরদের ওপর সুলতানের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য তাকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ভারতের মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর সময় কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। তিনি ফকির–দরবেশ ও জ্ঞানী–গুণীদের সমাদর করতেন।

ইলতুতমিশের উত্তরাধিকারী পুত্র–কন্যাগণ : ইলতুতমিশের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন নাসিরউদ্দিন মাহমুদ। কিন্তু ইলতুতমিশ বেঁচে থাকতেই তিনি মারা যান। ইলতুতমিশের অন্য পুত্রগণ সিংহাসনের উপযুক্ত ছিলেন না। তাই ইলতুতমিশ তাঁর কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু এ মনোনয়ন অস্বীকার করে অভিজাতগণ ইলতুতমিশের দ্বিতীয় পুত্র রুকুনউদ্দিনকে সিংহাসনে বসান। তিনি ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল ও অযোগ্য।

রুকুনউদ্দিনের অযোগ্যতার কারণে অভিজাতগণ অবশেষে রাজিয়াকে সুলতান নিযুক্ত করেন। রাজিয়াই একমাত্র মহিলা যিনি দিল্লির সিংহাসনে বসেন। রাজিয়া মাত্র চার বছর শাসন করেন। শাসনকার্যে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন। তা সত্ত্বেও প্রভাবশালী অভিজাত ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অনেকেই এ নারীর শাসন মেনে নিতে চাইলেন না। এরকম এক জন বিদ্রোহী ছিলেন সরহিন্দের শাসনকর্তা আলতুনিয়া। রাজিয়া তাঁকে দমন করার জন্য অগ্রসর হয়ে নিজেই বন্দী হন। এ সুযোগে রাজিয়ার অপর ভাই বাহরাম শাহ দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। রাজিয়া আলতুনিয়াকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সাহায্যে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা দুই জনেই বাহরামের হাতে বন্দী হন। পরে তাঁদেরকে হত্যা করা হয় (১২৪০)। বাহরাম শাহ মাত্র দুই বছর শাসন করেন। তাকে হত্যা করে অভিজাতগণ রুকুনউদ্দিনের পুত্র মাসুদ শাহকে সিংহাসনে বসান। মাসুদ শাহও অকর্মণ্য ছিলেন। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে অভিজাতগণ ১২৪৬ সালে ইলতুতমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে সিংহাসনে বসান।

সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬–১২৬৬) : সুলতান নাসিরউদ্দিন ছিলেন শান্ত, উদার, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু প্রকৃতির লোক। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য তিনি ফকির বাদশাহ নামে পরিচিত। কথিত আছে যে. তিনি কুরান নকল ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার স্ত্রী ও শ্বশুর বলবনই ছিলেন তার আমলে রাজ্যের প্রকৃত শাসক। বলবনের দক্ষতায় তাঁর শাসনামল শান্তিপূর্ণ ছিল। নাসিরউদ্দিন প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। তিনি গুণীজনের সমাদর করতেন। ১২৬৬ সালে তার মৃত্যু হয়।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬–১২৮৭) : নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর বলবন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন নামধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। প্রাথমিক জীবনে তিনিও ক্রীতদাস ছিলেন। সুলতান হওয়ার পর বলবন মন্ত্রী থাকাকালীন তার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগান। তিনি ছিলেন দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কঠোর প্রকৃতির শাসক। তিনি অভিজাতদের অবাধ্যতা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করেন। তাঁর দরবারে কোন প্রকার হাসি মস্করা চলত না। দুর্বলের ওপর সবলের কোন অত্যাচার তিনি সহ্য করতেন না। তিনি ন্যায় বিচারক ছিলেন। তিনি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করতেন না। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'ভারতের তোতা পাখি' নামে পরিচিত আমীর খসরু বলবনের দরবার অলংকৃত করেন। মোঙ্গলদের আক্রমণে মধ্য এশিয়া থেকে বহু বিদ্বান ব্যক্তি ও রাজ্যহারা রাজা তাঁর দরবারে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। ১২৮৭ সালে প্রায় বিরাশি বছর বয়সে বলবনের মৃত্যু হয়।

বলবনের উত্তরাধিকারীগণ : বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ মুহম্মদ পিতার জীবদ্দশাতেই মোঙ্গলদের হাতে নিহত হন। বলবন বাংলার বিদ্রোহ দমন করে তাঁর ছোট ছেলে বুঘরা খানকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি পিতার উত্তরাধিকারী হওয়া অপেক্ষা বরং বাংলার শাসনকর্তা থাকতেই পছন্দ করলেন। বলবন তাই যুবরাজ মুহম্মদের পুত্র কায়খসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অভিজাতগণ বুঘরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে দিল্লির সিংহাসনে বসান। কায়কোবাদ ছিলেন অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সে অরাজকতার মধ্যে জালালউদ্দিন খলজী কায়কোবাদ ও তার নাবালক পুত্র কায়মুরসকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসনে বসেন। এভাবে প্রাথমিক যুগের তুর্কী শাসনের অবসান ঘটে এবং খলজী শাসনের সূচনা হয়।

খলজী শাসন (১২৯০–১৩২০ সাল)

জালালউদ্দিন খলজী প্রাথমিক যুদ্ধে তুর্কী শাসনের অবসান করে খলজী শাসনের পত্তন করেন। তিনি যখন সুলতান হন, তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর বছর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির। মারাত্মক অপরাধীকেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিনকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর সাথে তিনি নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আলাউদ্দিনকে কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আলাউদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। তিনি বৃদ্ধ জালালউদ্দিনকে হত্যা করে ১২৯৬ সালে নিজেই সিংহাসনে বসেন।

আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬–১৩১৬) : আলাউদ্দিন খলজী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী শাসক। এ সময় প্রায় প্রতি বছর মোঙ্গল আক্রমণ হত। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন। তিনি সাফল্যের সঙ্গে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন।

আলাউদ্দিন খলজীর রাজ্য জয় : আলাউদ্দিন খলজী ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। প্রথমেই তিনি উত্তর ভারত জয় করেন। উত্তর ভারতে তিনি গুজরাট, রনথম্ভোর, চিতোর, মালব প্রভৃতি জয় করেন। এর ফলে কার্যত সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয়। এরপর তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। দক্ষিণ ভারতে আলাউদ্দিন খলজী দেবগিরি, বরঙ্গাল, দ্বারসমুদ্র, মাদুরা প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতকে সরাসরি নিজের শাসনাধীনে আনেননি। দক্ষিণ ভারতের রাজাদের মৌখিক আনুগত্য স্বীকার এবং নিয়মিত কর প্রদানেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

আলাউদ্দিন খলজীর শাসন ব্যবস্থা : আলাউদ্দিন খলজী অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সুশাসক ছিলেন। শাসন কাজে তিনি আলেমদের কর্তৃত্ব স্বীকার করতেন না। তিনি আমীরদের ঘন ঘন বিদ্রোহের কারণ উদ্‌ঘাটন করেন। তারা যাতে বিদ্রোহ করতে না পারে সেজন্য কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুলতানের অনুমতি ছাড়া তাঁরা পারস্পরিক মেলামেশা করতে পারতেন না। নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা করতে হলে সুলতানের কাছে পূর্বেই অনুমতি নিতে হত। রাষ্ট্রের মধ্যে কেউ বিপুল অর্থের অধিকারী হতে পারত না। রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সুলতান কঠোর গুপ্তচর প্রথার প্রবর্তন করেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ সকল গুপ্তচর সুলতানের অসংখ্য চোখ ও কান হিসাবে কাজ করত। অর্থাৎ, কোন কিছুই সুলতানের নিকটে গোপন থাকত না, তিনি যেন সবকিছুই দেখতে ও শুনতে পেতেন। ফলে সাধারণ মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করত। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার সুলতান বরদাশত করতেন না। তিনি নিজে মদ্যপান ত্যাগ করেন এবং রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন।

আলাউদ্দিন খলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : আলাউদ্দিন খলজী যাতে কম খরচে বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে পারেন সেজন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাজার দর বেধে দেন। চাল, আটা, গম, বার্লি, কাপড়, গরু, মহিষ, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতির দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দাবি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। ওজনে কেউ কম দিতে পারত না। কোন বিক্রেতা ওজনে কম দিলে, যে পরিমাণ কম দিত সে পরিমাণ মাংস তার শরীর থেকে কেটে নেওয়া হত। বাজারে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। আলাউদ্দিন খলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। তবে এ ব্যবস্থা শুধু রাজধানী দিল্লি ও তার আশপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আলাউদ্দিন খলজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব : আলাউদ্দিন খলজী স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর শাসননীতির মূল লক্ষ্য। তিনি শিল্পানুরাগী ছিলেন। বিখ্যাত আলাই দরওয়াজা তাঁরই কীর্তি। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী, কবি হোসেন দেহলবী, কবি আমীর খসরু প্রমুখ গুণীজন তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খলজীকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। ১৩১৬ সালে সুলতান মৃত্যুবরণ করেন।

আলাউদ্দিন খলজীর উত্তরাধিকারীগণ : আলাউদ্দিন খলজীর শেষ জীবন সুখের হয়নি। তিনি তার মন্ত্রী মালিক কাফুরের ইচ্ছামত কাজ করতে বাধ্য হন। মালিক কাফুরের ইচ্ছায় তিনি তার বড় দুই ছেলে খিজির খান ও সাদী খানকে বন্দী করার আদেশ দেন। তিনি তার শিশু পুত্র শিহাবউদ্দিনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তার তৃতীয় পুত্র মুবারককে শিহাবউদ্দিনের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। অল্পদিনের মধ্যে মুবারক শিহাবউদ্দিনকে অন্ধ ও সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই সিংহাসনে বসেন। তিনি কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করে ১৩১৬ থেকে ১৩২০ সাল পর্যন্ত শাসন করেন।

তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দু ধর্মান্তরিত খসরু মালিক নামে এক ব্যক্তির হাতে রাজ্য পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। খসরু মালিক মুবারক শাহকে হত্যা করে ১৩২০ সালে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অভিজাতগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। অবশেষে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিক তাকে পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর অভিজাতগণের অনুরোধে গাজী মালিক দিল্লির সিংহাসনে বসেন। ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি গিয়াসউদ্দিন তুঘলক উপাধি গ্রহণ করেন। এভাবে দিল্লির শাসন কর্তৃত্বে খলজী বংশের অবসান ঘটে এবং তুঘলক বংশ অধিষ্ঠিত হয়।

তুঘলক শাসন (১৩২০–১৪১৩ সাল)

তুঘলক বংশ প্রায় ৯৪ বছর দিল্লি সালতানাতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ বংশের তিন জন সুলতানের শাসনামল গুরুত্বপূর্ণ। এ তিন জন শাসক হচ্ছেন–গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, মুহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলক।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ও তাঁর শাসনকাল (১৩২০–১৩২৫) : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পূর্বনাম ছিল গাজী মালিক। খলজী শাসনামলে তিনি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৩২০ সালে তিনি খলজী বংশের অবসান ঘটিয়ে তুঘলক বংশের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর শাসনামল মাত্র পাঁচ বছর স্থায়ী হয়। তিনি সুশাসক ছিলেন। তিনি পতিত জমিতে শস্য উৎপাদনের জন্য প্রজাদের উৎসাহিত করতেন। জমিতে জলসেচের জন্য তাঁর নির্দেশে বহু খাল খনন করা হয়েছিল। তিনি অনেকগুলো রাজপথ ও সেতু নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে উৎপন্ন শস্যের মাত্র এক–দশমাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হত। দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য তিনি কর্মচারীদের ভাল বেতন দিতেন। তিনি সুবিচারক, তেজস্বী ও মহানুভব শাসক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি বাংলার বিদ্রোহ দমন করে বাংলাকে সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও লখনৌতি–এ তিন ভাগে ভাগ করেন।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যু : সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলার বিদ্রোহ দমন করে দিল্লি ফিরে যাচ্ছিলেন। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাঁর পুত্র জুনা খান দিল্লির উপকণ্ঠে আফগানপুরে একটি মঞ্চ তৈরি করেন। হঠাৎ এ মঞ্চ ধসে পড়ে। সুলতান এ মঞ্চের নিচে চাপা পড়ে প্রাণ হারান। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন এ দুর্ঘটনার পিছনে জুনা খানের হাত ছিল। কিন্তু এ অভিযোগের সঠিক কোনো প্রমাণ নেই।

সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫–১৩৫১) : দুর্ঘটনায় গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জুনা খান সুলতান হন এবং মুহম্মদ বিন তুঘলক নাম গ্রহণ করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাশালী। তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। গণিত, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। তার হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তিনি ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযমী ও সচ্চরিত্র।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনা : সুলতান হওয়ার পর মুহম্মদ বিন তুঘলক কতকগুলো পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর, খোরাসান অভিযান, কারাচিল অভিযান, প্রতীক মুদ্রার প্রচলন এবং দোয়াবে কর বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য।

দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর : সুলতান দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। দেবগিরির নতুন নাম রাখা হয় দৌলতাবাদ। দাক্ষিণাত্যে সুশাসনের জন্য এবং মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রাজধানী নিরাপদ করার জন্য সুলতানের এ উদ্যোগ ছিল যুক্তিযুক্ত। তাঁর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি প্রশাসনিক কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকে দৌলতাবাদে যাবার আদেশ দেন। কিন্তু নানা কারণে কর্মচারীদের দৌলতাবাদ পছন্দ না হওয়ায় এবং উত্তর ভারতে মোঙ্গল আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় তিনি রাজধানী দিল্লিতে ফিরিয়ে আনেন। এতে রাজকোষের বহু অর্থ খরচ হয় এবং দিল্লি থেকে দৌলতাবাদ যাতায়াতে কর্মচারীগণ অশেষ কষ্ট ভোগ করে।

খোরাসান অভিযান : সুলতান খোরাসান অভিযানের পরিকল্পনা করেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি ৩ লক্ষ ৭০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন। কিন্তু এক বছর এ বাহিনী পোষণের পর তিনি এ পরিকল্পনাও বাতিল করেন এবং সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেন। কর্মচ্যুত বিক্ষুব্ধ সৈন্যরা বিভিন্ন স্থানে লুটতরাজ শুরু করে।

কারাচিল অভিযান : সুলতান হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কারাচিল অভিযানের জন্য সৈন্য পাঠান। কিন্তু দুর্গম পথ ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় এ সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়।

প্রতীক মুদ্রার প্রচলন : সুলতান তামার প্রতীক মুদ্রা প্রচলনের সিদ্ধান্ত নেন। পরিকল্পনাটি যথাযথই ছিল। কিন্তু সে যুগের জনগণ পরিকল্পনাটি বুঝতে পারেনি। কেননা এটি ছিল যুগের জন্য অনুপযোগী। তামার ধাতুমূল্য রুপা বা সোনার সমান নয়। কিন্তু সরকার এদের বিনিময়মূল্য সমান ঘোষণা করল। প্রতীক মুদ্রা জাল না হওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা সে যুগে ছিল না। ফলে ব্যাপকভাবে মুদ্রা জাল হতে থাকে। এ জন্য সুলতানকে এ পরিকল্পনাও ত্যাগ করতে হয়। এতে রাষ্ট্র আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দোয়াবে কর বৃদ্ধি : তিনি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে প্রচলিত করের হার বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে বছর দোয়াব অঞ্চলে ফসল ভাল হয়নি। বর্ধিত হারে কর আদায়ের জন্য সরকারের লোকেরা প্রজাদের ওপর জুলুম শুরু করে। প্রজারা বনে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে থাকে। সুলতানের কানে এ খবর পৌঁছালে এ অবস্থায় সুলতান করের বর্ধিত হার প্রত্যাহার করেন এবং প্রজাদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নেন।

সুলতানের মূল্যায়ন : অনেক ঐতিহাসিক মুহম্মদ বিন তুঘলককে পরস্পর বিরোধী গুণের মিশ্রণে সৃষ্ট মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আবার তাকে খেয়ালী বা পাগল সুলতানও বলেছেন। আসলে সুলতান ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাশালী। তবে কোন পরিকল্পনার ভাল মন্দ উভয় দিক স্থিরচিত্তে বিচার করার মত ধৈর্য তাঁর ছিল না। তিনি বিরোধিতা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যা ভাল বলে মনে করতেন তৎক্ষণাৎ তা কার্যকর করতে চাইতেন। সমসাময়িক জনগণ তাঁর পরিকল্পনাগুলো বুঝে উঠতে পারেনি। তিনি ছিলেন যুগের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১–১৩৮৮) : মুহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর আমীর ওমরাহদের অনুরোধে ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে বসেন। ফিরোজ ছিলেন মুহম্মদ বিন তুঘলকের চাচাতো ভাই। তাঁর মা ছিলেন হিন্দু রমণী। ফিরোজ শান্তিপ্রিয় শাসক ছিলেন। মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে দাক্ষিণাত্য স্বাধীন হয়ে যায়। ফিরোজ শাহ দাক্ষিণাত্য পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টাই করেননি। ১৩৩৮ সালে বাংলাও স্বাধীন হয়ে যায়। শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহের সময় বাংলা পুনর্দখলের জন্য ফিরোজ শাহ দুই বার অভিযান করেন। কিন্তু তাঁর কোন অভিযানই সফল হয়নি। তিনি শুধু সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। তবে এ জন্য তাঁর প্রচুর জনবল ও অর্থবলের ক্ষতি হয়।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন ব্যবস্থা : ফিরোজ শাহ খুব প্রজাদরদী শাসক ছিলেন। তিনি প্রজাদের করের বোঝা লাঘব করেন। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেন। তাঁর সময়ে যমুনা নদী থেকে কাটা একটি খাল এখনও ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের কর্ণাল ও হিসার অঞ্চলে সেচের পানি সরবরাহ করে। তিনি ফৌজদারি দণ্ডবিধি সংশোধন করেন। তিনি এক জন বড় নির্মাতা ছিলেন। তিনি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অনাথ, এতিম ও দুঃস্থদের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ করতেন। ১৩৮৮ সালে ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যু হয়।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের উত্তরাধিকারীগণ : ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তুঘলক শাসন শিথিল হয়ে পড়ে। ফিরোজের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ১৩৮৮ থেকে ১৩৯৮ সাল পর্যন্ত পর পর ছয় জন সুলতান সিংহাসনে বসেন। এ বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহের সময় বিখ্যাত তুর্কী বীর তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন।

তৈমুর ছিলেন মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের অধিপতি। শৈশবে একটি পা খোঁড়া হয়ে যায় বলে তিনি তৈমুর লঙ নামে অভিহিত। পিতার মৃত্যুর পর তিনি চুঘতাই তুর্কী সম্প্রদায়ের নেতা হন। মধ্য এশিয়ায় বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ১৩৯৮ সালে তিনি ভারত অভিযান করেন। তৈমুরকে বাধাদানের কোনো ক্ষমতা দুর্বল মাহমুদ শাহের ছিল না। তৈমুর প্রায় বিনা বাধায় দিল্লি প্রবেশ করেন। প্রায় তিন মাস ধরে অবাধ হত্যা ও লুণ্ঠনের পর তিনি বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। ফিরে যাওয়ার আগে তিনি খিজির খানকে লাহোর ও মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। তৈমুরের আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ আক্রমণের ফলে তুঘলক বংশ একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তৈমুর চলে যাওয়ার পর মাহমুদ শাহ দিল্লির শাসন ক্ষমতা ফিরে পেলেও তা দিল্লি ও তার আশপাশে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৪১৩ সালে মাহমুদ শাহের মৃত্যুর সাথে সাথে তুঘলক বংশের সমাপ্তি ঘটে।

সৈয়দ বংশ : ১৪১৪ থেকে ১৪৫১ সাল পর্যন্ত খিজির খান ও তার বংশধরেরা শাসন করেন। খিজির খানের প্রতিষ্ঠিত বংশ উপমহাদেশের ইতিহাসে সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত।

লোদী বংশ : ১৪৫১ সালে সৈয়দ বংশের অবসান ঘটিয়ে বাহলুল লোদী নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান শাসনামলে একমাত্র লোদী বংশের শাসকরাই ছিলেন পাঠান বা আফগান। ১৪৫১ থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত এ বংশের শাসন বজায় থাকে। বাহলুল লোদী, সিকান্দার লোদী ও ইবরাহিম লোদী ছিলেন এ বংশের পরপর তিন জন শাসক। ইবরাহিম লোদীর শাসনামলে মুঘল আক্রমণ ঘটে। এ আক্রমণের নেতা ছিলেন তৈমুর লঙের বংশধর জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবুর। ১৫২৬ সালে বাবুর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করেন। বাবুর তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরের মত ভারত আক্রমণ করে লুণ্ঠিত ধনসম্পদ নিয়ে এ দেশ থেকে চলে যাননি। তিনি এ দেশেই রাজ্য স্থাপন করে স্থায়ীভাবে থেকে যান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম মুঘল বংশ। এভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতানী শাসনের অবসান এবং মুঘল শাসনের সূচনা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
   ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক
   খ. ইলতুতমিশ
   গ. আলাউদ্দিন খলজী
   ঘ. মুহাম্মদ বিন তুঘলক

২. আলাউদ্দিন খলজী বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণের জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?
   ক. সেনাবাহিনীর বেতনভাতা বৃদ্ধিকরণ
   খ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ
   গ. রাজস্ব সংগ্রহ নিয়মিতকরণ
   ঘ. কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩–৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শাসক	রাজত্বকাল
সুলতান কুতুবউদ্দিন	১২০৬–১২১০
শামসউদ্দিন ইলতুতমিশ	১২১১–১২৩৬
আলাউদ্দিন খলজী	১২৯৬–১৩১৬
গিয়াসউদ্দিন তুঘলক	১৩২০–১৪১৩

৩. দানশীলতার জন্য অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন সুলতানকে লাখ বকস উপাধি দেওয়া হয়।
   ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক
   খ. শামসউদ্দিন ইলতুতমিশ
   গ. আলাউদ্দিন খলজী
   ঘ. গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

৪. শামসউদ্দিন ইলতুতমিশ ও আলাউদ্দিন খলজীর শাসনকালের মধ্যে ব্যবধান কত?
   ক. ৫০ বছর   খ. ৬০ বছর
   গ. ৭০ বছর   ঘ. ৮০ বছর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, শক্তিশালী, বিচক্ষণ ও সুশাসক শাসন। কাজে তিনি আলেমদের কর্তৃত্ব স্বীকার করতেন না। রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি গুপ্তচর প্রথার প্রবর্তন করেন। বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাজার দর বেধে দেন। তিনি শিল্পানুরাগী ছিলেন।

   ক. এখানে কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে?
   খ. তাঁর আমলে কোন বিক্রেতা ওজনে কম দিলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত?
   গ. তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সুশাসক ছিলেন–উক্তিটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
   ঘ. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখায় তাঁর গৃহিত পরিকল্পনাগুলো মূল্যায়ন কর।

২. তুঘলক বংশের তিনজন বিখ্যাত সুলতানের মধ্যে তিনি একজন। এই অত্যন্ত মেধাবী সুলতান ১৩২৫ সালে সিংহাসনে আরোহণের পর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু নানাবিধ কারণে তার সব কটি পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইতিহাসে তাঁকে স্ববিরোধী চরিত্রের অধিকারী কিংবা খেয়ালী শাসকও বলা হয়।

ক. অনুচ্ছেদে কোন সুলতানের কথা বলা হয়েছে?

খ. তাঁর পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা কর।

গ. তাঁর তামার প্রতীক মুদ্রা প্রচলনের সিদ্ধান্তটি কোন যুগের অনুপযোগী ছিল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. একজন শাসক হিসেবে এই সুলতানের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুঘল শাসন, শূর শাসন ও মুঘল শাসন

মুঘল শাসন (১৫২৬–১৫৪০ সাল)

জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবুর (১৫২৬–১৫৩০) : জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবুর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তুর্কিস্থানের ফারগনা রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার দিক থেকে তৈমুর লঙ এবং মায়ের দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। বাবুর তুর্কী শব্দ। এর অর্থ সিংহ। বাবুর তাঁর নামের সার্থকতা প্রমাণ করেছিলেন। বাস্তব জীবনে তিনি সিংহের মত সাহস ও তেজস্বিতা দেখিয়ে গেছেন।

বাবুরের বাল্যজীবন : বাবুরের পিতার নাম ওমর শেখ মির্জা। তিনি ছিলেন ফারগনার অধিপতি। বাবুরের বয়স যখন মাত্র ১১ বছর তখন তাঁর পিতা মারা যান। এ অল্প বয়সেই তিনি ফারগনার সিংহাসনে বসেন। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তিনি দক্ষতার সঙ্গে সেসব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেন এবং মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সমরকন্দ দখল করেন। কিন্তু সমরকন্দ জয়ের সময় আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রে তিনি ফারগনার কর্তৃত্ব হারান। তিনি ফারগনার বিদ্রোহ দমন করতে গেলে সমরকন্দও তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায়। কিছুদিন বাবুরকে রাজ্যহারা, আশ্রয়হারা অবস্থায় ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে হয়। প্রথমজীবনের দুঃখকষ্ট বাবুরকে পরবর্তী জীবনের উপযোগী করে তুলেছিল।

বাবুরের কাবুল দখল : এ সময় কাবুলের সিংহাসন নিয়ে গোলযোগ দেখা দেয়। বাবুর অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহায়তায় ১৫০৪ সালে কাবুল জয় করেন এবং কাবুলের আমীর হন।

ভারত অভিযান : বাবুর ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে ভারত জয়ের ইচ্ছা জাগে। তখন দিল্লির সিংহাসনে ছিলেন ইবরাহিম লোদী। তাঁর শাসনে অভিজাতগণ ছিলেন অসন্তুষ্ট। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী এবং সুলতানের চাচা আলম খান লোদী দিল্লির সিংহাসন দখলের জন্য বাবুরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুযোগ সন্ধানী বাবুর সাথে সাথে এ আহ্বানে সাড়া দেন। তিনি বিনা বাধায় লাহোর জয় করেন। স্বয়ং বাবুরকেই রাজ্য জয়ে সচেস্ট দেখে দৌলতখান ও আলম খান তাঁর বিরোধিতা শুরু করেন। অগত্যা সে বছর বাবুরকে কাবুলে ফিরে যেতে হয় (১৫২৫ সাল)।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ : পরবর্তী বছর বাবুর বার হাজার সৈন্যকে কামান বন্দুকে সজ্জিত করে ভারত আক্রমণ করেন। ইবরাহিম লোদী তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য এগিয়ে যান। ইবরাহিম লোদীর ছিল প্রায় এক লাখ সৈন্য। কিন্তু ১৫২৬ সালে সংঘটিত পানিপথের যুদ্ধে বাবুরের উন্নত রণকৌশল ও যুদ্ধাস্ত্রের কাছে ইবরাহিমের বিশাল সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। ইবরাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। বাবুর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খানুয়া ও গোগরার যুদ্ধ : বাবুরের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাকে আরো যুদ্ধ করতে হয়। ১৫২৭ সালে তিনি রাজপুত বীর রানা সংগ্রাম সিংহের মুখোমুখি হন। খানুয়ার প্রান্তরে রাজপুতদের সাথে বাবুরের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত বাবুর জয়লাভ করেন। ১৫২৯ সালে বাবুরকে আফগানদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হলেও আফগান শক্তি সমূলে বিনষ্ট হয়নি। তারা ইবরাহিম লোদীর ভাই মাহমুদ লোদীর নেতৃত্বে আবার সমবেত হয়। কিন্তু বাবুর অগ্রসর হয়ে গোগরার যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করেন।

বাবুরের কৃতিত্ব : এভাবে পানিপথ, খানুয়া ও গোগরার যুদ্ধসমূহে জয়লাভের ফলে বাবুরের নেতৃত্বে ভারতে মুঘল শাসন শুরু হয়। বাবুর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এ সাম্রাজ্যসুখ তিনি বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। কথিত

আছে যে, বাবুর তাঁর পুত্র অসুস্থ হুমায়ুনের আরোগ্যের বিনিময়ে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন। পরে বাবুর অসুস্থ হয়ে ১৫৩০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাবুরের মৃতদেহ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাবুলে সমাহিত করা হয়।

বাবুর পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী তুজুক–ই–বাবুর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আত্মকথা। এ আত্মকথা ভারতে মুঘল ইতিহাসের খুব নির্ভরযোগ্য উপকরণ। বাবুর সন্তানবৎসল ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তিনি তাঁর প্রজাদেরকে খুব ভালবাসতেন। শাসন ব্যাপারে তিনি ধর্ম ও বর্ণের ভেদাভেদ করতেন না।

নাসিরউদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন (১৫৩০–১৫৪০) : বাবুরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাম্রাজ্য সংহত করার আগেই বাবুরের মৃত্যু হওয়ায় সিংহাসনে বসে হুমায়ুন নানা বিপদের সম্মুখীন হন। তাছাড়া যোগ্যতার দিক দিয়ে হুমায়ুন বাবুরের সমকক্ষ ছিলেন না। পিতার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী ভাইদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে দিয়ে হুমায়ুন নিজের বিপদ আরো বাড়িয়ে তোলেন। তিনি কামরানকে কাবুল ও কান্দাহার, হিন্দোলকে মেওয়াট এবং আসকারীকে সম্ভলপুরের শাসক নিযুক্ত করেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কামরান পাঞ্জাব দখল করে নেন। অথচ প্রয়োজনের সময় ভাইয়েরা হুমায়ুনকে তেমন কোনো সাহায্যই করেননি। এ জন্য মুঘলদেরকে চরম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

শের খানের সাথে হুমায়ুনের সংঘর্ষ : সিংহাসনে বসেই হুমায়ুন পূর্বাঞ্চলের আফগানদের দমন করার জন্য অগ্রসর হন। এ সময় আফগান নেতা শের খান শূর হুমায়ুনের নিকট মৌখিক আনুগত্য জানান। এরপর হুমায়ুন গুজরাটের বাহাদুর শাহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সে সুযোগে শের খান পুনরায় শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। তাঁকে দমন করার জন্য হুমায়ুন বিহারের দিকে অগ্রসর হন। তিনি শের খানের চুনার দুর্গ দখল করেন। এরপর তিনি বাংলার দিকে এগিয়ে যান। এরকম বিনা বাধায় তিনি বাংলা দখল করেন। হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড়ের নাম রাখেন জান্নাতবাদ। বর্ষা এসে পড়ায় প্রায় নয় মাস হুমায়ুনকে গৌড়ে অবস্থান করতে হয়। এ সুযোগে শের খান জৌনপুর, বারানসী প্রভৃতি জয় করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এতে হুমায়ুনের দিল্লি ফেরার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বর্ষাশেষে হুমায়ুন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বক্সারের কাছে চৌসা নামক স্থানে হুমায়ুন শের খান কর্তৃক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হন। চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ সাল) পরাজিত হয়ে হুমায়ুন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে দিল্লি পৌঁছেন। বিজয়ী শের খান 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। পরের বছর (১৫৪০ সাল) শের শাহের বিরুদ্ধে হুমায়ুন আবার অভিযান করেন। কিন্তু কনৌজের নিকট বিলগ্রামের যুদ্ধে তিনি এবারও পরাজিত হন। বিজয়ী শের শাহ দিল্লি ও আগ্রা দখল করে নেন। রাজ্যহারা হুমায়ুন কিছু দিন এখানে সেখানে ঘুরে পরে পারস্যে চলে যান। ভারতে সাময়িকভাবে মুঘল শাসনের অবসান হয়। শের শাহ পুনরায় ভারতে পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

শূর শাসন (১৫৪০–১৫৫৫ সাল)

শেরশাহ শূর (১৫৪০–১৫৪৫) : মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরপর দুইটি যুদ্ধে পরাজিত করে শেরশাহ ভারতে শূর বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর শাসন করেন। এ পাঁচ বছর তাঁকে নানা যুদ্ধে বিগ্রহে কাটাতে হয়। এ পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতনার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৫৪৫ সালে কালীঞ্জর দুর্গ জয়ের সময় বারুদের বিস্ফোরণে তিনি মারা যান।

শের শাহের শাসন ব্যবস্থা : শের শাহ ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। প্রজার কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর শাসনের একমাত্র লক্ষ্য। তার শাসন ব্যবস্থার অনেক কিছুই পরবর্তী মুঘল শাসনামলে, এমনকি ব্রিটিশ শাসনকালেও অপরিবর্তিত থাকে। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যকে ৪৭টি সরকার বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। সরকারগুলো আবার পরগনাতে বিভক্ত ছিল। পরগনাগুলোর শাসনের জন্য তিনি আমিন, শিকদার, কারকুন প্রভৃতি রাজ

কর্মচারী নিযুক্ত করেন। এ কর্মচারিদের আবার নির্দিষ্ট সময় অন্তর বদলির ব্যবস্থা ছিল। শের শাহ 'পাট্টা ও 'কবুলিয়ত' প্রথার প্রবর্তন করেন। এর ফলে জমিতে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। জমির উর্বরতা অনুসারে রাজস্ব নির্ধারিত হত। সাধারণত উৎপন্ন শস্যের এক–চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য হত। উৎপন্ন শস্য বা নগদ অর্থে রাজস্ব দেওয়া যেত। ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তিনি কর ব্যবস্থা সহজ করেন। তিনি সড়ক–ই–আজম নামে বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত একটি দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেন। এ রাস্তা রাজধানী আগ্রাকে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে যুক্ত করেছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজগণ এ রাস্তাটি সংস্কার করে এর নাম দেয় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। এটি ছাড়াও তিনি আরো অনেক দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করেন। পথিকদের সুবিধার জন্য এ সকল রাস্তার পাশে তিনি সতেরশ সরাইখানা স্থাপন করেন। সরাইখানাগুলো ডাকচৌকি হিসেবেও ব্যবহার করা হত। ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক আনা–নেওয়া হত। তার সুশাসনে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হয়। দেশে চুরি ডাকাতি রাহাজানি ছিল না। তিনি মুদ্রা ব্যবস্থারও সংস্কার করেন। তিনি রুপার টাকা প্রচলন করেন। ধর্মের ব্যাপারে শের শাহ ছিলেন উদার। তিনি সকল ধর্মের লোককেই যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করতেন।

শের শাহের উত্তরাধিকারীগণ (১৫৪৫–১৫৫৫) : শের শাহের উত্তরাধিকারীগণ কেউ যোগ্য ছিলেন না। শের শাহের পর তাঁর পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৪ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তাঁর চাচা আদিল শাহ তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন। ইবরাহিম শাহ নামে এক জন আমীর তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে দিল্লি ও আগ্রা দখল করেন। সিকান্দার শাহ নামে অপর এক জন আমীর ইবরাহিমকে পরাজিত করে তাঁর কাছ থেকে দিল্লি ও আগ্রা কেড়ে নেন।

মুঘল শাসন (দ্বিতীয় পর্যায়)

শূর বংশের এ অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে হুমায়ুন আবার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি সরহিন্দের যুদ্ধে সিকান্দার শূরকে পরাজিত করে দিল্লি ও আগ্রা পুনর্দখল করেন। এভাবে ১৫৫৫ সালে ভারতে পুনরায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্রাট আকবর (১৫৫৬–১৬০৫)

হুমায়ুনের মৃত্যু ও আকবরের সিংহাসন লাভ : হুমায়ুন মুঘল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কিন্তু এ সৌভাগ্য তিনি বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। লাইব্রেরির সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পড়ে গিয়ে তিনি দারুণভাবে আহত হন এবং কিছু দিন পরেই মৃত্যুবরণ করেন (১৫৫৬ সাল)। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আকবর সিংহাসনে বসেন। এ সময় আকবরের বয়স ছিল মাত্র সাড়ে তের বছর।

আকবরের অভিভাবক হিসেবে বৈরাম খান : নাবালক আকবরের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাঁর পিতৃবন্ধু বৈরাম খান। ১৫৫৬ সাল পর্যন্ত চার বছর বৈরাম খান আকবরের অভিভাবক ছিলেন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ : হুমায়ুন যখন মারা যান, তখন আকবর ছিলেন পাঞ্জাবের কালানৌরে। বৈরাম খান সেখানেই তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করেন। ইতোমধ্যে আগ্রা ও দিল্লি হিমুর হাতে চলে যায়। হিমু ছিলেন আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি। বৈরাম খান হিমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পানিপথের প্রান্তরে মুঘল ও পাঠানদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৫৫৬ সালে সংঘটিত এ যুদ্ধ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে হিমু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। তাঁকে হত্যা করা হয়। এ যুদ্ধের ফলে দিল্লি ও আগ্রা মুঘলদের দখলে আসে।

বৈরাম খানের পদচ্যুতি : ১৫৬০ সালে আকবর বৈরাম খানকে পদচ্যুত করেন। বৈরামের প্রতি আকবরের মা হামিদা বানু বেগম ও ধাত্রীমাতা মাহাম আনাগারের বৈরী মনোভাব ছিল। বৈরাম ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তাঁর অসামান্য

ক্ষমতা অন্যান্য সুন্নী আমীরদের ঈর্ষার কারণ হয়। প্রকৃতপক্ষে বৈরাম খুবই ক্ষমতাদর্শী ও অহংকারী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে আকবরও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নিতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি শুধু নামে রাজা থাকতে চাইলেন না, কাজেও রাজা হতে চাইলেন। সুতরাং বৈরাম খানকে রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে মক্কা চলে যেতে বলা হয়। প্রথমে রাজি হলেও পরে বৈরাম বিদ্রোহী হন। আকবরের সাথে বৈরামের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বৈরাম পরাজিত হন। আকবর তাঁকে ক্ষমা করেন। মক্কা যাওয়ার পথে গুজরাটে বৈরাম খান জনৈক আফগান কর্তৃক নিহত হন। এ আফগানের পিতা সরহিন্দের যুদ্ধে বৈরামের হাতে নিহত হয়েছিলেন। বৈরাম খান সারা জীবন মুঘলদের সেবা করেছেন। হুমায়ুন ও আকবর বৈরামের নিকট নানাভাবে ঋণী।

আকবরের রাজ্য জয় ও উদার নীতি : আকবর উত্তরাধিকার সূত্রে কাবুল, কান্দাহার ও পাঞ্জাবের কিয়দংশের মালিক হন। বৈরাম খানের সহযোগিতায় তিনি দিল্লি ও আগ্রা পুনর্দখল করেন। বৈরাম খানের অভিভাবকত্বকালে তিনি আজমীর, জৌনপুর ও গোয়ালিয়র জয় করেন। নিজের হাতে শাসন ক্ষমতা নেয়ার পর তিনি মালব ও গণ্ডোয়ানা জয় করেন। আকবর রাজপুতদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অম্বরের রানা বিহারী মল্ল আকবরের সাথে নিজ কন্যার বিয়ে দেন। এ বিয়ে মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। মুসলমান শাসক গোষ্ঠির সাথে হিন্দু অভিজাতগোষ্ঠির সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন হিন্দুকে উচ্চ রাজকাজে নিযুক্ত করা হয়। ভগবান দাস, মানসিংহ, টোডরমল, বীরবল প্রমুখ ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। অমুসলমানদের ওপর আরোপিত জিজিয়া কর ও তীর্থকর উঠিয়ে দিয়ে আকবর তাদের মন জয় করেন। কিন্তু মেবারের রানা উদয় সিংহ কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করলেন না। তাঁর সাথে আকবরের যুদ্ধ হয়। ১৫৬৮ সালে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর জয় করে নেন। এতেও মেবারের রানা নতিস্বীকার করেননি। উদয়সিংহের পর তাঁর পুত্র রানা প্রতাপসিংহ মুঘল বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যান। কিন্তু তিনি চিতোর পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। আকবর প্রতাপ সিংহের বীরত্বের খুব প্রশংসা করতেন।

চিতোরের পতনের পর বিকানীর, জয়সলমীর প্রভৃতি রাজপুত রাজ্য আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে এবং তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এরপর আকবর গুজরাট, বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণ ভারত বিজয়ে অগ্রসর হন। দক্ষিণ ভারতের আহমদনগর, বেরার ও খান্দেশ আকবরের দখলে আসে। এভাবে যোগ্যতা বলে আকবর এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন।

আকবরের শাসন ব্যবস্থা : আকবর শুধু বিশাল সাম্রাজ্যই স্থাপন করেননি, এর সুশাসনেরও ব্যবস্থা করেন। শাসনের সুবিধার জন্য তিনি সাম্রাজ্যকে পনেরটি সুবায় বিভক্ত করেন। সুবাগুলো ছিল দিল্লি, আগ্রা, আজমীর, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আহমদাবাদ, মালব, লাহোর, মুলতান, কাবুল, বাংলা, বিহার, আহমদনগর, বেরার ও খান্দেশ। আকবর প্রত্যেক সুবায় এক জন করে সুবাদার নিযুক্ত করেন। শাসন কাজে সুবাদারকে সাহায্য করার জন্য দিউয়ান, বকশী, সদর, আমিল, ফৌজদার, বিতিকছি, কোতোয়াল, পোদ্দার, ওয়াকিয়ানবিস, কাজি প্রভৃতি কর্মকর্তা ছিলেন। কেন্দ্রে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সম্রাট নিজে। তাঁর একটি মন্ত্রণা পরিষদ ছিল। বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন বিভিন্ন শাসন বিভাগের দায়িত্বে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল কর্মচারীকে সামরিক ও বেসামরিক উভয় প্রকার দায়িত্বই পালন করতে হত। রাজ কর্মচারিদের সুবিন্যস্ত করার জন্য তিনি মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করেন। আকবর টোডরমলের সহায়তায় ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন।

টোডরমল জমি জরিপ করেন। উৎপন্ন শস্যের এক–তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য করা হয়। প্রজারা নগদ অর্থে অথবা ফসলের মাধ্যমে রাজস্ব দিতে পারত।

আকবরের ধর্মমত : আকবর ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার ছিলেন। তিনি ফতেপুর সিক্রিতে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করেন। এখানে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা হত। সকল ধর্মের পণ্ডিতগণ এখানে আসার আমন্ত্রণ পেতেন। তাঁরা নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে

বক্তব্য রাখতেন। আকবর মনোযোগ সহকারে তাঁদের বক্তব্য শুনতেন। অবশেষে সকল ধর্মের সারবস্তা নিয়ে তিনি একটি নতুন ধর্মমত গঠন করেন। এর নাম দেয়া হয় দীন–ই–ইলাহী। এ ধর্ম গ্রহণ করার জন্য আকবর অবশ্য কারও ওপর চাপ দেননি।

আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব : আকবর সুশাসক ছিলেন। তিনি প্রজার মঙ্গল কামনা করতেন। তিনি জ্ঞানী–গুণীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর দরবারে আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে শিল্প ও স্থাপত্যের খুবই উন্নতি হয়। প্রায় ৫০ বছর গৌরবের সাথে রাজত্ব করার পর ১৬০৫ সালে ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক আকবর মৃত্যুবরণ করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫–১৬২৭)

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিম নুরুদ্দীন জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে মুঘল সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় মেবারের রানা অমর সিংহ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং কাংড়া দুর্গ মুঘলদের দখলে আসে।

খসরুর বিদ্রোহ : জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু পিতার বিদ্রোহী হন। জাহাঙ্গীর এ বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহে খসরু পঞ্চম শিখ গুরু অর্জুনের সাহায্য লাভ করেন। খসরুকে অন্ধ করে দেওয়া হয়। অর্জুন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জাহাঙ্গীরের ওপর নূরজাহানের প্রভাব : নূরজাহানের পূর্ব নাম মেহেরউননিসা। তাঁর পিতা মির্জা গিয়াস বেগ ইরান থেকে ভারতে আসেন। প্রথমে মেহেরউননিসার বিয়ে হয় আলী কুলি খানের সাথে। আকবরের শাসনকালে আলী কুলি খান বর্ধমানের জায়গির লাভ করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি বিদ্রোহী হলে তাঁকে হত্যা করা হয়। এক কন্যাসহ মেহেরউননিসাকে মুঘল হেরেমে নেওয়া হয়। বিধবা হওয়ার চার বছর পর সম্রাটের সাথে তার বিয়ে হয়। মেহেরউননিসা অপূর্ব রূপবতী ও গুণবতী মহিলা ছিলেন। ধীরে ধীরে সম্রাটের ওপর তাঁর প্রভাব বাড়তে থাকে। সম্রাট তাকে নূরজাহান উপাধি দেন। সম্রাটের নামের সাথে তাঁর নামও মুদ্রায় অঙ্কিত হয়।

বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন : সম্রাট আকবর বাংলা জয় করলেও সারা বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলার প্রধান প্রধান জমিদারগণ যারা বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে তারা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। জাহাঙ্গীর তাঁদের দমনের জন্য ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। ইসলাম খান রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। ঢাকার নতুন নাম দেওয়া হয় জাহাঙ্গীরনগর। তিনি বার ভূঁইয়াদের দমন করেন। ফলে বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

জাহাঙ্গীরের শেষ জীবন : জাহাঙ্গীরের শেষ জীবন সুখের ছিল না। তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রথম দুই পুত্রের মৃত্যু হয়। তৃতীয় পুত্র খুররম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সেনাপতি মহাব্বত খানও বিদ্রোহ করেন। সম্রাট ও নূরজাহানকে কাবুল যাওয়ার পথে মহাব্বত খান বন্দী করেন। নূরজাহানের বুদ্ধিবলে সম্রাট মুক্তি পান। বিদ্রোহী মহাব্বত খান দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়ে যুবরাজ খুররমের সাথে যোগ দেন। এরূপ অশান্তির মধ্যে ১৬২৭ সালে অক্টোবর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব : জাহাঙ্গীরের চরিত্রে বিপরীত গুণাবলির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। একদিকে তিনি ছিলেন যেমনি কঠোর, অপরদিকে তেমনি কোমল। তিনি নিজে চিত্রকর ও কবি ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার আত্মজীবনী 'তুজুক–ই–জাহাঙ্গীর' তাঁর সাহিত্য কীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন। তবে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে তাঁর অনেক সৎ গুণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

সম্রাট শাহজাহান (১৬২৮–১৬৫৮)

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খুররম সিংহাসনে বসেন। তখন তাঁর নাম হয় শিহাবউদ্দিন মুহম্মদ শাহজাহান।

বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য জয় : শাহজাহান তাঁর শাসনকালে বুন্দেলখণ্ডের রাজা জুঝরসিংহ এবং দাক্ষিণাত্যের সুবাদার খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁর আদেশে বাংলা থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎখাত করা হয়। তাঁর শাসনামলে আহমদনগর জয় সম্পূর্ণতা পায়। শাহজাহান গোলকুন্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদ্বয়কে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

জাঁকজমক ও স্থাপত্য শিল্প : শাহজাহানের শাসনকালের সর্বাধিক খ্যাতি জাঁকজমক ও স্থাপত্য শিল্পের জন্য। তাঁর শাসনামলে স্থাপত্য শিল্পে শ্বেত মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়। শাহজাহান দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি দিল্লিতে দিউয়ান–ই–আম ও দিউয়ান–ই–খাস নির্মাণ করেন। সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের স্মৃতিতে নির্মিত সমাধি সৌধ আগ্রার তাজমহল সম্রাটের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্প। স্থাপত্য কর্ম হিসেবে দিল্লির জাম–ই–মসজিদ এবং আগ্রার মতি মসজিদ খুব বিখ্যাত। মণি মুক্তা খচিত স্বর্ণমণ্ডিত ময়ূর সিংহাসন শাহাজাহানের আর এক অপূর্ব সৃষ্টি। দরবারের জাঁকজমক ও স্থাপত্য শিল্পের উন্নতির জন্য শাহজাহানের শাসনকালকে মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ : শাহজাহানের শেষজীবন সুখের হয়নি। ১৬৫৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ বেগমের গর্ভে চারপুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুত্রদের নাম দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ এবং কন্যাদের নাম জাহান আরা ও রওশন আরা। ভ্রাতৃযুদ্ধে জাহান আরা দারার পক্ষ এবং রওশন আরা আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করেন। যুদ্ধে অপর ভাইদের পরাজিত করে আওরঙ্গজেব ক্ষমতা দখল করেন। দারা ও মুরাদকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। সুজা আরাকানে পালিয়ে যান। সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়। শাহজাহান দীর্ঘ আট বছর বন্দী অবস্থায় থেকে ১৬৬৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব : শাহজাহান জনদরদী শাসক ছিলেন। তিনি পুত্র কন্যাদের খুব ভালবাসতেন। তাঁর পত্নীপ্রেমের তুলনা হয় না। তিনি তাঁর পত্নী মমতাজ মহলের সমাধির ওপর ''তাজমহল'' নামে একটি সমাধি সৌধ নির্মাণ করে পত্নী প্রেমের স্মৃতিকে চিরভাস্বর করে রেখেছেন। তাঁর সৌন্দর্যপ্রীতি ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। বহু পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও শিল্পী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮–১৭০৭)

সিংহাসনে আরোহণ : ১৬৫৮ সালে জুলাই মাসে আওরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মহিউদ্দিন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ গাজী উপাধি ধারণ করেন।

আওরঙ্গজেবের কৃতিত্ব : আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণের পরেই ভারতের উত্তর–পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি আসামে অহোমদের এবং উত্তরবঙ্গে কোচদের দমন করেন। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করেন এবং আরাকানের মগদের দমন করেন। চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিতাড়িত করা হয়। উত্তর–পশ্চিম সীমান্তেও তিনি আফগান উপজাতিদের দমন করেন।

রাজপুতদের সাথে আওরঙ্গজেবের সম্পর্ক : সম্রাট আকবরের সময় থেকে রাজপুতদের সঙ্গে মুঘলদের যে সম্পর্ক ছিল, আওরঙ্গজেবের সময়ে সে সম্পর্কের অবনতি হয়। ১৬৭৮ সালে মাড়োয়াররাজ যশোবন্ত সিংহ মারা যান। আওরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহের এক আত্মীয়কে যোধপুরের সিংহাসনে বসান। কিন্তু মাড়োয়ারের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যশোবন্ত সিংহের শিশু পুত্র অজিত সিংহকে সিংহাসনে বসানোর দাবি করেন। রাজপুত নেতা দুর্গাদাসের হঠকারিতার

কারণে আওরঙ্গজেবের সাথে রাজপুতদের যুদ্ধ শুরু হয়। মেবারের রানা রাজসিংহ অজিত সিংহের পক্ষ নেন। অবশেষে ১৬৮১ সালে উদয়পুরের পতন হলে রাজপুতগণ মুঘলদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন।

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যনীতি : আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে দমন করা, বিজাপুর ও গোলকুন্ডা দখল করা এবং মারাঠা শক্তির উত্থানকে প্রতিহত করা। সম্রাট তাঁর তিনটি উদ্দেশ্যই অর্জন করেন। বিদ্রোহী পুত্র আকবর পালিয়ে যান, বিজাপুর ও গোলকুন্ডা মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে এবং সম্রাট মারাঠা রাজধানী দখল করেন। কিন্তু এর জন্য সম্রাটকে চরম মূল্য দিতে হয়। এতে তাঁর প্রচুর জনবল ও অর্থবল খরচ হয়। উত্তর ভারত থেকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার ফলে সম্রাট উত্তর ভারতের সমস্যার দিকে নজর দিতে পারেননি। দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন উত্তর ভারতের শাসন ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ে। সম্রাটের দাক্ষিণাত্য নীতি সুফল বয়ে আনেনি। এ নীতি তাঁর দেহ ও মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তাকে করে বিতর্কিত।

আওরঙ্গজেবের চরিত্র : আওরঙ্গজেব ছিলেন রণকুশলী যোদ্ধা, দক্ষ কূটনীতিক ও প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। কথিত আছে যে, বলখের যুদ্ধ চলাকালে যখন তীব্র গোলাগুলি চলছিল, তখন তিনি শত্রু-মিত্র সকলকে হতবাক করে ঘোড়া থেকে নেমে জোহরের নামায আদায় করেন। আল্লাহর প্রতি অটুট বিশ্বাসের এরূপ নমুনা ইতিহাসে কমই দেখা যায়। কোন প্রকার বিলাসিতা তাঁকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারেনি। কুরআন শরীফ নকল করে এবং নিজের হাতে টুপি সেলাই করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি প্রজাদরদী শাসক ছিলেন। উপযুক্ত হলে তিনি বিধর্মীকেও উচ্চরাজ কাজে নিযুক্ত করতেন। যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহের ন্যায় অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকাজে নিয়োজিত ছিলেন। আওরঙ্গজেব জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর করতেন। তিনি এক জন মহান শাসক ছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করার পর ১৭০৭ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন মুঘল বংশের শেষ শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ ও মুঘল বংশের পতন

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল বংশের ক্রমাবনতি ও পতনের ধারা সূচিত হয়। আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ সবাই ছিলেন দুর্বল। তারা রাজকাজে অমনযোগী ছিলেন। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ধরে রাখার মত ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ : আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোয়াজ্জম সিংহাসনে বসেন। তিনি বাহাদুর শাহ আলম উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সম্রাট ছিলেন ফররুখশিয়র। তাঁর শাসনামলে সৈয়দ হোসেন ও সৈয়দ আবদুল্লাহ নামে দুই ভাই রাষ্ট্রে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ফররুখশিয়রের পর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বাহাদুর শাহের পুত্র মুহম্মদ শাহকে দিল্লির সিংহাসনে বসান। মুহম্মদ শাহের পর তাঁর পুত্র আহমদ শাহ সম্রাট হন। তারপর নামমাত্র সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় আলমগীর। তিনি তাঁর উজির ইমাম উল মুলকের হাতের পুতুল ছিলেন।

আমীরদের স্বার্থপরতা : দুর্বল সম্রাটদের শাসনামলে মুঘল আমীরগণ ব্যক্তি স্বার্থকে দেশের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে থাকেন। তাঁরা ছিলেন তিন ভাগে বিভক্ত-হিন্দুস্থানি আমীর, ইরানি আমীর ও তুরানি আমীর। তাঁরা পারস্পরিক গোষ্ঠি কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ : সম্রাট মুহম্মদ শাহের শাসনামলে ১৭৩৯ সালে পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ করে দিয়ে যান। নাদির শাহ ভারত থেকে প্রচুর ধনরত্ন, কোহিনুর মণি ও ময়ূর সিংহাসন পারস্যে নিয়ে যান।

আহমদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণ : আহমদ শাহ আবদালী ছিলেন নাদির শাহের সেনাপতি। তিনি নাদির শাহের

মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের স্বাধীন অধিপতি হন। তিনি মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালের শেষ দিকে ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি যুবরাজ আহমদ শাহের নিকট পরাজিত হয়ে ফিরে যান। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি সম্রাট আহমদ শাহর রাজত্বকালে দুই বার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি অনেক ধনরত্ন লুট করে নিয়ে যান। দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালে আহমদ শাহ আবদালী চতুর্থ বার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি আবার দিল্লি লুট করেন এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর প্রভৃতির শাসন দায়িত্ব মুঘল সম্রাটের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। এভাবে এককালের প্রবল পরাক্রমশালী মুঘল শক্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়টি সরকারে বিভক্ত করেন?

ক. ৪৫টি খ. ৪৬টি

গ. ৪৭টি ঘ. ৪৮টি

২. শাহজাহানের শাসনকালের সর্বাধিক খ্যাতি–

i. রণকুশলী যোদ্ধার জন্য

ii. জাঁকজমক ও স্থাপত্য শিল্পের জন্য

iii. জ্ঞানী–গুণীদের সমাদর করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের ছকের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শাসক	নির্মাণ কার্য	সভাসদ
শেরশাহ শুর সম্রাট আকবর সম্রাট শাহজাহান	তাজমহল, দিউয়ান–ই–আজম সড়ক–ই–আজম ইবাদত খানা	ভগবান দাস, আবুল ফজল, মানসিংহ, ঈশা খাঁ টোডরমল, বৈরাম খাঁ, বীরবল, চন্ডীদাস

৩. শেরশাহ শূর এর নির্মাণ কার্য কোনটি?

ক. তাজমহল

খ. সড়ক–ই–আজম

গ. ইবাদত খানা

ঘ. দিউয়ান–ই–আজম

৪. সম্রাট আকবরের সভাসদ ছিলেন–
   ক. ভগবান দাস, মানসিংহ, টোডরমল ও বীরবল
   খ. চন্ডীদাস, মানসিংহ, টোডরমল ও আবুল ফজল
   গ. ভগবান দাস, ঈশা খাঁ, টোডরমল ও বীরবল
   ঘ. টোডরমল, বৈরাম খাঁ, চন্ডীদাস ও বীরবল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. প্রদত্ত তথ্যগুলো একজন সম্রাটের।

বয়স	যুদ্ধ পরিচালনা বিভক্তিকরণ	সাম্রাজ্য	ধর্ম	রাজত্বকাল
১৩ বছর	পানিপথের ২য় যুদ্ধ, দিল্লী ও আগ্রা জয়	১৫টি সুবাতে	দ্বীন–ই–ইলাহী	৫০ বছর

   ক. উল্লিখিত তথ্য কোন সম্রাট সম্পর্কিত?
   খ. এই সম্রাটের প্রচলিত ধর্মের বর্ণনা দাও।
   গ. অমুসলমানদের প্রতি তাঁর নীতি কীভাবে রাজ্য জয়ে সাহায্য করেছে? ব্যাখ্যা কর।
   ঘ. উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে তাঁর অবদান মূল্যায়ন কর।

২. সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, রণকুশলী যোদ্ধা এবং দক্ষ কূটনীতিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুঘল রাজ বংশের পতনের সূচনা হয়। মূলত তার উত্তরাধিকারীরা সকলেই ছিলেন দুর্বল ও অমনোযোগী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড়ছেলে মোয়াজ্জেম হোসেন বাহাদুর শাহ আলম উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সম্রাটগণ ছিলেন যথাক্রমে ফররুখশিয়ার, মুহম্মদ শাহ, আহমদ শাহ, দ্বিতীয় আলমগীর। এ সময় মুঘল আমীরগণ পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হন।

   ক. সম্রাট আওরঙ্গজেব কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
   খ. তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রধান অযোগ্যতাটি অনুচ্ছেদের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
   গ. কলহ বিবাদ কীভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়? ব্যাখ্যা কর।
   ঘ. মুঘল বংশের শেষ শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসেবে আওরঙ্গজেব এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

মধ্যযুগে বাংলাদেশ (১২০৪–১৭৫৭ সাল)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে মধ্যযুগে বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করা হবে।

বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় : বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী। তিনি আফগানিস্তানের গরমশীরের (আধুনিক দস্ত–ই–মার্গ) অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে মনে করা হয়, ছোটবেলা থেকেই সৈনিক হওয়ার উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল। এ কারণে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েই তিনি প্রথমে মুহম্মদ ঘুরী এবং পরে কুতুবউদ্দিন আইবেকের সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি বাদাউনে যান। বাদাউনের শাসনকর্তা তাঁকে অল্প বেতনে একটি ছোট চাকরি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অল্পদিনের মধ্যেই এ চাকুরি ত্যাগ করে অযোধ্যায় চলে যান। অযোধ্যার শাসনকর্তা তাঁর কদর বুঝতে পেরে তাঁকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করেন এবং তাঁকে বিউলী ও ভাগওয়াত নামে দুইটি পরগনার জায়গীর দিয়ে মির্জাপুর জেলায় পাঠিয়ে দেন। এখানে তিনি এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে পূর্ব প্রান্তস্থিত এলাকাগুলোতে অভিযান চালিয়ে বহু ধন–সম্পদ সংগ্রহ করেন এবং ১২০৩ সালে বিহার দখল করেন। বিহার দখলের পর তিনি বাংলার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। এ সময়ে বাংলার রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। শারীরিকভাবে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তবুও পশ্চিম ভারতে মুসলিম বিজয়ের কথা তার জানা ছিল। মুসলিমগণ যে কোন সময়ে বাংলা আক্রমণ করতে পারে এ ধারণাও তার ছিল। তাই তিনি তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে তেলিয়াগর্হিতে সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছিলেন। কিন্তু চতুর বখতিয়ার খলজী এ পথে না এসে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সৈন্য নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি এত দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিলেন যে তাঁর সাথে মাত্র ১৮ জন সৈন্য আসতে পেরেছিলেন। বাকি সৈন্যগণ পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। বখতিয়ার যখন নদীয়ার তোরণদ্বারে উপস্থিত হন তখন অশ্ববিক্রেতা মনে করে তাঁকে কেউই বাধা দেয়নি। ফলে তাঁরা বিনা বাধায় রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। সেখানে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হলে পাল্টা আক্রমণ করে রক্ষীদেরকে নিহত করে ফেলেন। ফলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে ও বাইরে এক দারুণ ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে তাঁর মূল বাহিনীও এসে পড়ে। রাজা লক্ষণ সেন তখন মধ্যাহ্নভোজনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বখতিয়ার খলজীর অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে রাজপ্রাসাদের পেছন দরজা দিয়ে নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। এভাবে সহজেই বখতিয়ার খলজী নদীয়া অধিকার করতে সক্ষম হন। নদীয়া দখলের পর তিনি গৌড় দখল করেন (১২০৫ সাল)। অতঃপর তিনি সমগ্র উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন। তিনি প্রথমে তাঁর শাসন কেন্দ্র লক্ষণাবতীতে (গৌড়) স্থাপন করেন। পরে তিনি দেবকোটে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং এখান থেকেই তিনি ১২০৬ সালে তিব্বত অভিযানে বের হন। তাঁর এ অভিযান ব্যর্থ হয় এবং তিনি অতি কষ্টে দেবকোটে ফিরে আসেন। বখতিয়ার খলজী ১২০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই বিজয়ের ফলে বাংলার সমাজে নতুন হাওয়া এসে লাগল। মুসলিম শাসকদের রাজত্বকালে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়। সুফি–সাধকদের উদার চিন্তা বাংলার সামাজিক চেতনার সঙ্গে মিলে নতুন রূপ লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্য থেকে আগত শাসকেরা স্থানীয় জীবনধারায় অনেক নতুন উপাদান যোগ করে।

মুহম্মদ শিরণ খলজী ও আলী মর্দান খলজী : ১২০৬ থেকে ১২১২ সাল পর্যন্ত বখতিয়ার খলজীর সহযোদ্ধা মুহম্মদ শিরণ খলজী ও আলী মর্দান খলজী শাসন করেন। এ সময় মুসলিম অধিকৃত বাংলা শাসিত হত দেবকোট থেকে।

গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজী : ১২১২ থেকে ১২১৭ সাল পর্যন্ত শাসন করে বখতিয়ারের অপর সহচর হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ খলজী। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি বাংলার মুসলিম রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে তাঁর রাজধানী দেবকোট থেকে লখনৌতিতে স্থানান্তরিত করে নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন। কেননা তিনিই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন যে, নদীবহুল বাংলাদেশে নৌবাহিনী ছাড়া মুসলিম শাসন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। তিনি নতুন রাজধানীর প্রতিরক্ষার জন্য বসনকোটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও প্রথম সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি মুসলিম রাজ্যকে কতকগুলো সরকারে বিভক্ত করেন। তিনি সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করেন।

গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজী জনগণের কল্যাণ, ব্যবসায়–বাণিজ্যের উন্নতি ও সামরিক বাহিনীর সুবিধার জন্য রাজধানী লখনৌতির সাথে উত্তর দেবকোট ও দক্ষিণে লখনৌর শহরের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেন। তিনি লখনৌতির তিন পার্শ্বে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করেন। তিনি বহু খাল ও সেতু নির্মাণ করেন। স্থানে স্থানে তিনি বাঁধও নিমাণ করেন। ফলে লখনৌতি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পায় এবং কৃষিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়।

ইওয়াজ খলজী রাজ্য বিস্তারেও মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি লখনৌতির দক্ষিণ সীমান্তস্থল লখনৌর পুনরুদ্ধার করেন। পরে তিনি তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণ দিকে অজয় নদ থেকে দামোদর নদ ও বিষ্ণুপুরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ইওয়াজ খলজী এক জন জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। তিনি বহু মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন করেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তাঁর নামে খুতবাও পাঠ করা হত। ইওয়াজের সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন ইলতুতমিশ। ইলতুতমিশ ইওয়াজকে দমন করার জন্য সৈন্য পাঠান। ১২২৭ সালে ইওয়াজ খলজী ইলতুতমিশের সৈন্যদের হাতে নিহত হন।

বাংলায় তুর্কী শাসন ঃ এরপর বাংলা সরাসরি দিল্লীর শাসনাধীনে চলে যায়। ১২২৭ থেকে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত ৬০ বছর বাংলা পনের জন শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হয়। এ শাসকদের অনেকেই মুখে দিল্লির অধীনতা স্বীকার করলেও কার্যত স্বাধীন ছিলেন। দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব এবং রাস্তাঘাটের দুর্গমতার জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্রোহ হত। ঘন ঘন বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার জন্য বাংলাকে বলা হত 'বুলগাকপুর' বা বিদ্রোহী নগরী। বিদ্রোহী শাসকদের মধ্যে তুঘরিল ছিলেন অন্যতম। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান মুগিসউদ্দিন তুঘরিল উপাধি ধারণ করেন। তুঘরিল ঢাকা ও ফরিদপুরের অনেক অঞ্চল জয় করেন। তিনি সোনারগাঁওয়ের নিকট নারিকেল্লা নামক স্থানে একটি দুর্গ তৈরি করেন। এ সময় দিল্লির সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। বলবন তুঘরিলকে দমন করার জন্য বাংলায় আসেন। তুঘরিল পরাজিত হন এবং ধরা পড়েন। তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর সহচরদের অনেককে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। অতঃপর বলবন তাঁর পুত্র বুঘরা খানকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লি ফিরে যান। বুঘরা খান পিতার অধীনে লখনৌতি শাসন করেন। বলবনের মৃত্যু হলে দিল্লীর সুলতান হন বুঘরা খানের পুত্র কায়কোবাদ। তখন বুঘরা খান

নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম নিয়ে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। দিল্লিতে কায়কোবাদ নিহত হলে বুঘরা খান খুবই ভেঙে পড়েন। তিনি অপর পুত্র কায়কাউসের হাতে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেন।

সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ : ১৩০১ সালে কায়কাউস মারা যান। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর মালিক ফিরোজ ইতগীন সিংহাসনে বসেন। তিনি উপাধি গ্রহণ করেন সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ। ফিরোজ ১৩০১ থেকে ১৩২২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। ইতোপূর্বে মুসলিম রাজ্য বিহার, উত্তর ও পশ্চিম বাংলা, দক্ষিণ–পশ্চিম বাংলায় লখনৌর পর্যন্ত এবং দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায়ও কিছুটা বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজত্বকালে বঙ্গ ও সাতগাঁও বিজয় সম্পূর্ণ হয়। এছাড়াও তাঁর আমলে ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চল মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে মুসলিম রাজ্যের সীমানাই শুধু বৃদ্ধি পায়নি, ইসলামের প্রচারও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর শাসনকালে হযরত শাহ জালাল ধর্ম প্রচারের কাজে সিলেটে এসেছিলেন। সাতগাঁও বিজয়ের সাথেও এক জন বিখ্যাত সুফীর নাম জড়িত।

লখনৌতির ওপর দিল্লির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা : সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজের পর লখনৌতির সুলতান হন তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর। তাঁর ছোট ভাই নাসিরউদ্দিন ইবরাহিম দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলককে বাংলা আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তাঁর পালক পুত্র বাহরাম খানের নেতৃত্বে লখনৌতির বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর যুদ্ধে পরাজিত হন। লখনৌতির ওপর আবার দিল্লির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলার শাসন ব্যবস্থা : বাংলা ত্যাগের আগে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলার মুসলিম রাজ্যকে লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও এ তিন ভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক ভাগে আলাদা আলাদা শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। লখনৌতিতে ছিলেন নাসিরউদ্দিন ইবরাহিম, আর সাতগাঁও ও সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা করা হয় বাহরাম খানকে। মুহম্মদ বিন তুঘলক শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন। তিনি নাসিরউদ্দিন ইবরাহিমকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান এবং গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে মুক্তি দিয়ে বাহরাম খানের সাথে সোনারগাঁওয়ের যুগ্ম শাসক নিযুক্ত করেন। সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় ইজ্জউদ্দিন ইয়াহিয়াকে। আর লখনৌতির শাসক করা হয় কদর খানকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বখতিয়ার খলজী কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

ক. পাকিস্তান খ. ভারত

গ. বাংলাদেশ ঘ. আফগানিস্তান

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ছিলেন অত্যন্ত দুরদর্শী, কুশলী ও সুদক্ষ শাসক। ১২০৩ সালে বিহার বিজয় করলেও ১২০৪ সালে তার বাংলা বিজয় ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

২. বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ে কাজ করেছিল তাঁর–
   i. সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব
   ii. অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষ
   iii. রণকৌশল

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i
   খ. ii
   গ. iii
   ঘ. i ও iii

৩. ১২০৩ সালে বিহার জয়ের পর বখতিয়ার খলজী কোন দিকে নজর দেন?
   ক. বাংলা
   খ. বিহার
   গ. উড়িষ্যা
   ঘ. আসাম

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুমন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে গতবছর পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থ হয়। তার বন্ধু সোয়েব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে এতে মন খারাপ করার কিছু নেই। তুমি আবার পরীক্ষা দাও। অবশ্যই তুমি সফল হবে। তুমি কী ইতিহাসে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর কথা পড়নি। তিনি মুহম্মদ ঘুরী, কুতুবউদ্দিন আইবেকের সৈন্যদলে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত অযোধ্যায় যেয়ে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর মেধার পরিচয় দিয়ে অনেক যুদ্ধে সফলতা লাভ করেন এবং বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
   ক. বখতিয়ার খলজী কাকে পরাজিত করে নদীয়া জয় করেন?
   খ. বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের প্রধান ফলাফল ব্যাখা কর।
   গ. সুমন কীভাবে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সফল হতে পারে?
   ঘ. বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় ছিল একজন মেধাবী সৈনিকের উন্নত রণকৌশলের ফল–মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সোনারগাঁও–এ ফখরউদ্দিন মুবারক শাহী শাসন

(১৩৩৮–১৩৫২ সাল)

ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮–১৩৪৯) : ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের পূর্বনাম ফখরা। তিনি ছিলেন সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের সিলাহদার বা বর্মরক্ষক। তিনি প্রভু বাহরাম খানকে হত্যা করে সোনারগাঁওয়ের শাসন ক্ষমতা দখল করেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীন সুলতান হিসেবে তিনি উপাধি গ্রহণ করেন ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ।

ফখরউদ্দিন স্বাধীনতা ঘোষণা করায় লখনৌতির শাসনকর্তা কদরখান এবং সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা ইজ্জউদ্দিন মিলিতভাবে সোনারগাঁও আক্রমণ করেন। ফখরউদ্দিন পালিয়ে যান। তিনি বর্ষার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতোমধ্যে কদর খান তাঁর সৈন্যদের লুট করা সম্পদের ভাগ না দেওয়ায় তারা অসন্তুষ্ট হয়। বর্ষাকাল এলে ফখরউদ্দিন কদর খানকে আক্রমণ করলেন। কদর খানের বহু সৈন্য অর্থের বিনিময়ে ফখরউদ্দিনের পক্ষে যোগ দেয়। ফলে যুদ্ধে কদর খান পরাজিত ও নিহত হন।

১৩৪৯ সাল পর্যন্ত ফখরউদ্দিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা জারি করেছিলেন।

ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহ (১৩৪৯–১৩৫২)

ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহ ১৩৫২ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। তাঁকে পরাজিত করে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও দখল করে নেন।

ইবনে বতুতার বর্ণনা

ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের শাসনামলে বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসেন। তিনি ছিলেন আফ্রিকার মরক্কো দেশের অধিবাসী। প্রথমে তিনি দিল্লিতে আসেন। সিলেটের হযরত শাহজালালের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যেই তিনি বাংলায় আসেন। তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন। সেখান থেকে সিলেটে যান। সিলেটে কিছুদিন থেকে তিনি নদীপথে সোনারগাঁওয়ে আসেন। সোনারগাঁও হতে তিনি জাহাজে চড়ে জাভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে ইবনে বতুতা চমৎকার বর্ণনা রেখে গেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এত প্রচুর চাল এবং খাদ্যদ্রব্যের এত কম দাম তিনি আর কোথাও দেখেননি। ইবনে বতুতা যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এটি ১৩৪৬ সালের মুদ্রামানে তৈরি করা হয়। তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

পণ্যের দাম	পরিমাণ	দাম
চাল	আনুমানিক ৮ মণ ৩০ সের	৭.০০ টাকা
ধান	আনুমানিক ২৮ মণ	৭.০০ টাকা
ঘি	আনুমানিক ১৫ সের	৩.৫০ টাকা
তিল তেল	আনুমানিক ১৪ সের	১.৭৫ টাকা
চিনি	আনুমানিক ১৪ সের	৩.৫০ টাকা
মুরগী	৮টি	০.৯০ টাকা
ভেড়া	১টি	১.৭৫ টাকা
দুগ্ধবতী গাভী	১টি	২১.০০ টাকা
পায়রা	১৫ টি	০.৯০ টাকা
সূক্ষ্ম সুতি কাপড়	১৫ গজ	১৪.০০ টাকা

ইবনে বতুতা বাংলাদেশের হাটে–বাজারে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেও দশ টাকা দিয়ে আশুরা নাম্নী এক জন সুন্দরী দাসী কেনেন। তখন ৭ টাকা দিয়ে ৩ জনের পরিবারের সারা বছরের খাদ্য শস্য কেনা যেত। ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম বন্দরে অনেক জাহাজ দেখেছেন। তিনি নদী পথে অসংখ্য নৌকা চলাচল করতে দেখেছেন। দেশে সুফী দরবেশদের খুব সম্মান ছিল। ফকির ও আলেমগণ বিনা ভাড়ায় নৌকায় চলাচল করতেন। বাংলাদেশের আবহাওয়া ইবনে বতুতার পছন্দ হয়নি। তিনি এদেশকে ভাল জিনিসে পরিপূর্ণ দোজখ বলেছেন।

ইলিয়াস শাহী শাসন (১৩৪২–১৪১২)

ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ যখন সোনারগাঁওয়ের স্বাধীন সুলতান, সে সময়ে আলী মুবারক লখনৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল আলাউদ্দিন আলী শাহ। ১৩৪২ সালে তাঁর দুধ ভাই হাজী ইলিয়াস তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত করে লখনৌতির সিংহাসনে বসেন এবং সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর নামানুসারে তাঁর বংশ ইলিয়াস শাহী বংশ নামে পরিচিত। ইলিয়াস শাহী বংশ ১৩৪২ থেকে ১৪১২ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২–১৩৫৭)

শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ পূর্ব ইরানের সিজিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সুলতান। তিনি বীরযোদ্ধা ছিলেন। লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করে ইলিয়াস শাহ রাজ্য বিস্তারে মন দেন। তিনি প্রথমে সাতগাঁও দখল করেন। অতঃপর তিনি নেপাল অভিযান করেন এবং সেখান থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে আসেন। নেপাল অভিযানের পর তিনি ত্রিহুত বা উত্তর বিহার আক্রমণ করেন এবং এর অংশবিশেষ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইলিয়াস শাহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজয় ছিল সোনারগাঁও দখল। ফখরউদ্দিন মুবারক শাহের মৃত্যুর পর সোনারগাঁওয়ের সুলতান হয়েছিলেন তাঁর পুত্র ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ। গাজী শাহকে পরাজিত করে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও দখল করে নেন (১৩৫২ সাল)। এভাবে বাংলা আবার একত্রিত হয়। বাংলার এ একত্রীকরণের কৃতিত্ব শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের। ইলিয়াস শাহকে দিল্লির ঐতিহাসিক শামস–ই–সিরাজ আফীফ 'শাহ–ই–বাঙ্গালাহ', 'শাহ–ই–বাঙ্গালিয়ান' অর্থাৎ বাংলার সুলতান, বাঙালিদের সুলতান বলেছেন। বাংলার বাইরে ইলিয়াস শাহ বিহারের কিছু অংশ–চম্পপারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করেছিলেন।

ইলিয়াস শাহকে দমন করার জন্য দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহ শক্তিশালী একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ইলিয়াস শাহকে পরাজিত করতে না পেরে ফিরোজ তুঘলক তাঁর সাথে সম্মানজনক সন্ধি করে দিল্লি ফিরে যান। ইলিয়াস শাহ দক্ষ সুলতান ছিলেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। জ্ঞানীগুণী ও সুফী দরবেশদের তিনি সম্মান করতেন। তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত সুফী–সাধক শেখ সিরাজ উদ্দিন ও শেখ বিয়াবানী বাংলায় এসেছিলেন। এদের মধ্যে শেখ বিয়াবানী ১৩৫৩ সালে ইন্তেকাল করেন। এ সময় ইলিয়াস শাহ দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় একডালা দুর্গে অবস্থান করছিলেন। এ অবস্থায়ও শেখ বিয়াবানীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইলিয়াস শাহ ছদ্মবেশে তাঁর শব মিছিলে যোগ দেন। ইলিয়াস শাহ ১৩৫৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৫৭–১৩৯৩)

শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ সুলতান হন। তিনি প্রায় ৩৫ বছর রাজত্ব করেন। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন পিতার মতই দক্ষ। তাঁকে দমন করার জন্যও ফিরোজ তুঘলক বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। সিকান্দার শাহ পিতার মতই একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবারও ফিরোজ তুঘলককে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

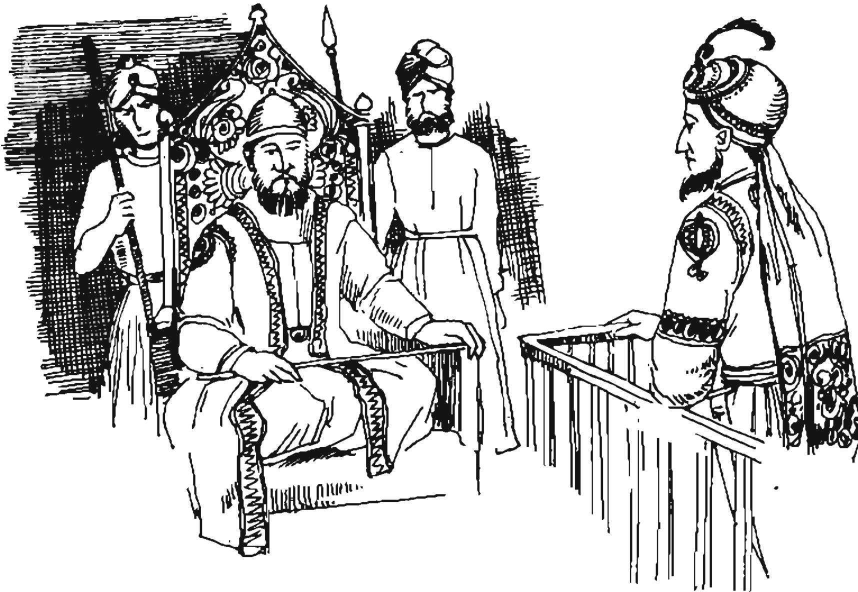
পিতার মত সিকান্দার শাহও প্রজাদরদী শাসক ছিলেন। তিনি অনেক রাস্তাঘাট, পুল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তাঁর শাসনামলে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। ফলে দেশে ব্যবসা–বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। তিনিও জ্ঞানীগুণী ও ফকির দরবেশদের খুব সম্মান করতেন। তাঁর সময় বাংলার মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি ঘটে। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ সিকান্দার শাহের কীর্তি।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩–১৪১১)

সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি আঠার বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় শাসক। তাঁর শাসনামলে যুদ্ধবিগ্রহ তেমন একটা হয়নি। আজম শাহ জ্ঞানী–গুণীর খুব সমাদর করতেন। তিনি নিজেও এক জন উঁচু মানের কবি ছিলেন। পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তাঁর পত্র বিনিময় হত।

আজম শাহ অত্যন্ত ন্যায় বিচারক ছিলেন। তাঁর ন্যায় বিচারের কথা গল্পের মত শোনায়। আমরা গিয়াসউদ্দিন ও কাজির বিচারের কথা জানি। তাঁর সুবিচার সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে। একদা অতর্কিতে তাঁর একটি তীরে কোন এক বিধবার একমাত্র পুত্র নিহত হয়। বিধবা কাজির নিকট সুলতানের বিরুদ্ধে নালিশ করলে কাজি সুলতানকে তলব করেন। সুলতান কাজির আদালতে উপস্থিত হলে কাজি দাঁড়িয়ে সুলতানকে সম্মান দেখালেন না। আদালতের নির্দেশানুযায়ী সুলতান বিধবাকে বহু টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিধবাকে সন্তুষ্ট করেন। এরপর কাজি দাঁড়িয়ে সুলতানকে সম্মান দেখান। এ সময় সুলতান কাজিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আজ আপনি যদি ন্যায় বিচার না করতেন, তাহলে আমার তরবারি দিয়ে আপনার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতাম। কাজিও নির্ভীকভাবে উত্তর দেন, আপনি যদি আমার আদালতের আদেশ মান্য না করতেন, তাহলে বেত্রাঘাতে আপনাকে জর্জরিত করতাম। কাজির ন্যায় বিচার ও সৎ সাহস দেখে সুলতান খুব সন্তুষ্ট হন এবং তাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসা নির্মাণ



৪.১ : কাজির বিচার

করেন। তিনি মক্কা ও মদীনায় মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এক জন দার্শনিক ছিলেন। তিনি সুফী–সাধকদের খুব সম্মান করতেন। তিনি বাংলা ভাষার পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়ে প্রথম বাঙালি কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্য ইউসুফ–জুলেখা রচনা করেন। আজম শাহ সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। এক বার তিনি কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আসার জন্য দাওয়াত জানালে প্রত্যুত্তরে কবি হাফিজ একটি সুন্দর কবিতা লিখে সুলতানের নিকট পাঠিয়ে দেন। আজম শাহ চীনের সম্রাট ইউঙলোর সঙ্গে রাজদূত বিনিময় করেন। তাঁর রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ান বাংলায় এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে সুন্দর একটি বিবরণ লেখেন। তার বিবরণ থেকে তৎকালীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ১৪১১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাইফউদ্দিন হামজাহ শাহ সুলতান হন।

শিহাবউদ্দিন ও তাঁর পুত্রের শাসন : সাইফউদ্দিন হামজাহ শাহের পর তাঁর ক্রীতদাস শিহাবউদ্দিন বাংলার সিংহাসন দখল করেন। তিনি অতি অল্পকাল রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন ফিরোজ সুলতান হন। তাঁর রাজত্বকালও ক্ষণস্থায়ী ছিল। রাজা গণেশ তাঁকে অপসারিত করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন।

ইলিয়াস শাহী যুগের কৃতিত্ব : ইলিয়াস শাহী যুগ বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ, সিকান্দার শাহ ও গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এ তিন জনের শাসনকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ তিন জন শাসক বাংলার যে কোন যুগের শাসকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান লাভের দাবিদার। ইলিয়াস শাহ বাংলার স্বাধীন সুলতানী দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ যদিও প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তবুও সে স্বাধীনতা প্রকৃত সফলতা পেয়েছিল ইলিয়াস শাহের দ্বারা। তিনি ও তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ ফিরোজ তুঘলকের অভিযানকে দুই দুই বার ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলার সামরিক খ্যাতি সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বাংলার বাইরেও তাঁদের সমর প্রতিভার ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইলিয়াস শাহী আমলে সুলতানগণ নিজেদেরকে বহিরাগত ভাবতেন না। তাঁরা নিজেদেরকে বাংলার মানুষ মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের শাসনামল থেকেই বাঙালি মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়।

স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ : ইলিয়াস শাহী যুগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। এ স্থাপত্য শিল্পে স্থানীয় প্রভাব ছিল। ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বহু মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ ও সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ সিকান্দার শাহের শাসনামলে নির্মিত হয়। এটি এ যুগের স্থাপত্য শিল্পের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার : ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তারেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এ বংশের প্রায় সকল সুলতানই সুফী ও আলেমগণকে বিশেষভাবে সাহায্য দান করতেন। এর ফলে এ যুগে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির খুব প্রসার ঘটে।

বহির্বিশ্বের সাথে পরিচিতি : ইলিয়াস শাহী যুগে বহির্বিশ্বের সাথে বাংলার মুসলিম রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ যুগে আরবদেশ ও পারস্যের সাথে বাংলার সংযোগ ঘটে। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ চীনের সাথে দূত বিনিময় করেন।

ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বাংলার স্বাধীনতাকে দৃঢ় করেন। তাঁরা সারা বাংলাকে এক শাসনের অধীনে আনেন। স্থানীয় জনগণের সমর্থন লাভে তাঁরা সক্ষম হন। এ যুগে স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগের স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ তাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব।

রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরদের শাসনকাল (১৪১৫–১৪৪২) : রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধর ১৪১৫ সাল থেকে

১৪৪২ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। রাজা গণেশ ভাতুরিয়ার জমিদার ছিলেন। তিনি আদি ইলিয়াস শাহী আমলের শেষের দিকে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিন ফিরোজকে হত্যা করে নিজেই বাংলার সিংহাসন দখল করতে সক্ষম হন।

রাজা গণেশ অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিমগণ সুফী–সাধক হযরত নূর কুতুব আলমের সাহায্য প্রার্থী হয়। এ পরিস্থিতিতে হযরত নূর কুতুব আলমের অনুরোধে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কী বাংলা আক্রমণ করেন। রাজা গণেশ পরাজিত হন। তাঁর পরাজয়ের পর তাঁর পুত্র যদু জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন (১৪১৮ সাল)।

শাসক হিসেবে জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ :

শাসক হিসেবে জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ সুনাম অর্জন করেন। তিনি তাঁর রাজধানী পান্ডুয়া থেকে গৌড়ে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালের শেষের দিকে খলিফাতুল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি এক জন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। তিনি গৌড়ে একটি মসজিদ, দুইটি জলাশয় ও একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। তিনি পান্ডুয়ায় এক লাখ টাকা ব্যয়ে এক লাখী নামক সমাধি–সৌধ তৈরি করেন। এটি বাংলার মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য সাধারণ নিদর্শন।

জালালউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসউদ্দিন আহমদ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১৪১৩ সাল)। তিনি ১৪৪২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ (১৪৪২–১৪৮৭)

১৪৪২ সালে আদি ইলিয়াস শাহী বংশের নাসির খান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে দেশে শান্তি বিরাজমান ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রুকনউদ্দিন বারবক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৫৯ সাল)। তিনি এক জন সুদক্ষ শাসক ছিলেন। উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযান তাঁর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর সময়ে চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। গৌড়ের রাজ প্রাসাদ ও দাখিল দরওয়াজা নামে পরিচিত বিরাট প্রবেশ তোরণটি তাঁর স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন। তিনি ১৪৭৪ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বারবকশাহের পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

হাবশী শাসন (১৪৮৭–১৪৯৩)

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ হাবশী ক্রীতদাসদের এক বিরাট বাহিনী গঠন করেছিলেন। কালক্রমে হাবশী ক্রীতদাসগণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ১৪৮৭ সালে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান ফতেহ শাহকে হত্যা করে বাংলার শাসন ভার হস্তগত করেন। চার জন হাবশী সুলতান প্রায় ছয় বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁদের কুশাসনে দেশের সর্বত্র অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শেষ হাবশী সুলতান শামসউদ্দিন মুজাফফর শাহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমীরগণ তাঁকে হত্যা করেন এবং উজির সৈয়দ হুসাইনকে বাংলার সিংহাসনে বসান। এভাবে বাংলায় হাবশী শাসনের অবসান হয়।

হুসাইন শাহী শাসন (১৪৯৩–১৫৩৮ সাল)

আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ (১৪৯৩–১৫১৯)

বংশ পরিচয় : আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের পিতার নাম সৈয়দ আশরাফ। তিনি তাঁর দুই ছেলে সৈয়দ হুসাইন ও ইউসুফকে নিয়ে তুর্কীস্থানের তিরমিজ শহর থেকে বাংলায় আসেন। তিনি রাঢ়ের চাঁদপাড়া মৌজায় বসতি স্থাপন করেন। চাঁদপাড়ার কাজির মেয়ের সাথে হুসাইনের বিয়ে হয়।

সিংহাসন লাভ : হুসাইন বাংলার রাজধানী গৌড় এ যান। সেখানে হাবশী সুলতান মুজাফফর শাহের অধীনে তাঁর চাকরি হয়। তিনি উজির পদে উন্নীত হন। মুজাফফর শাহ ছিলেন অত্যাচারী শাসক। অমাত্যগণ বিদ্রোহী হয়ে তাকে হত্যা করেন। অমাত্যগণ সৈয়দ হুসাইনকে সুলতান মনোনীত করেন। তিনি ১৪৯৩ সালে আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন।

দেশে শান্তি শৃঙ্খলা আনয়ন : আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ এক জন দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করেন। সিংহাসনে বসেই তিনি অরাজকতা দূর করেন। ফলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

রাজ্য জয় : এরপর তিনি রাজ্য বিস্তারে মন দেন। সবার আগে তিনি একটি সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। কামরূপ ও কামতা তাঁর দখলে আসে। তিনি উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্য দুটোরও কিছু অংশ জয় করেন। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের কিছু এলাকা তিনি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি চট্টগ্রাম থেকে আরাকানীদের বিতাড়িত করেন। চট্টগ্রামও তাঁর দখলে আসে। তিনি আসামে অভিযান পাঠিয়েছিলেন। তবে সে অভিযান ব্যর্থ হয়।

শাসন নীতি : হুসাইন শাহ জনদরদী শাসক ছিলেন। প্রজার কল্যাণই ছিল তাঁর শাসননীতির মূল লক্ষ্য। তাঁর শাসনামলে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা–বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। দেশে প্রাচুর্য ছিল। জনগণ সুখে শান্তিতে বাস করত।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : হুসাইন শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ফকির দরবেশদের তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় গোড়ামি ছিল না। কর্মচারি নিয়োগে তিনি গুণের কদর করতেন। বহু হিন্দুকে তিনি উচ্চ রাজকার্যে নিয়োগ করেন। তাঁর উজির ছিলেন পুরন্দর খান। গৌড় মল্লিক ছিলেন তাঁর এক জন সেনাপতি। রূপ ও সনাতন নামে দুভাই তাঁর খুব বিশ্বস্ত কর্মচারি ছিলেন। রূপ ছিলেন এক জন মন্ত্রী। তাঁর উপাধি ছিল সাকর মল্লিক। আর সনাতন ছিলেন সুলতানের দবীর–ই–খাস অর্থাৎ ব্যক্তিগত সচিব। সুলতানের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন মুকুন্দ দাস। হুসাইন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। সুলতানের কঠোর নির্দেশ ছিল যে, ধর্ম প্রচারে শ্রীচৈতন্যকে যেন কোন প্রকার বাধা দেওয়া না হয়। হুসাইন শাহের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার জন্য হিন্দু লেখকগণ তাঁকে নৃপতি তিলক, জগতভূষণ, কৃষ্ণাবতার প্রভৃতি উপাধি দেন।

শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক : হুসাইন শাহ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে বাংলা সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়। তাঁর কর্মচারি পরাগল খান, ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেছিলেন। বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, যশোরাজ খান প্রমুখ সাহিত্যিকগণ আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। হুসাইন শাহের সময় স্থাপত্য শিল্পেরও খুব উন্নতি হয়। তাঁর শাসনামলে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুমতিদ্বার নির্মিত হয়।

আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ ১৫১৯ সালে মৃত্যবরণ করেন। তিনি শুধু হুসাইন শাহী বংশেরই না স্বাধীন সুলতানী আমলেরও বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান।

সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ (১৫১৯–১৫৩২)

হুসাইন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবুল মুজাফফর নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। পিতার মত তিনিও দক্ষ শাসক ছিলেন। যুবরাজ হিসেবেই তিনি শাসনকাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। নুসরাত শাহ বাংলার রাজ্যসীমা আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি বিহারের আজমগড় পর্যন্ত অঞ্চল তাঁর অধীনে আনেন। তাঁর শাসনামলে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন হয়। বাবুর ১৫২৬ সালে ইবরাহিম লোদীকে পরাজিত করেন। এর ফলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। আফগান নেতাদের অনেকেই নুসরাত শাহের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। মানবতার কারণে তিনি তাঁদের আশ্রয় দেন। একই সাথে নুসরাত শাহ মুঘলদের প্রতি নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করেন। কিন্তু আফগান নেতাদের বৈরী মনোভাবের কারণে ১৫২৯ সালে বাবুর পূর্বাঞ্চলে অভিযান করেন। এ সময় নুসরাত শাহের সাথেও বাবুরের যুদ্ধ হয়। নুসরাত পরাজিত হন এবং বাবুরের সাথে সম্মানজনক সন্ধি করেন। এ সন্ধি দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। স্থির হয় যে, এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করবে না। গোগরা নদীর পূর্বাঞ্চল মুঘল অধিকারে আসে। কিন্তু নুসরাত শাহ বাবুরের আক্রমণ থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

নুসরাত শাহের শাসনামলে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করে । কিন্তু নুসরাত তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।

পিতার মত নুসরাতও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কবি শেখর নুসরাত শাহের এক জন কর্মচারি ছিলেন। নুসরাত শাহের শাসনামলে স্থাপত্য শিল্পেরও উন্নতি হয়। গৌড়ের বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ এবং কদম রসুল মসজিদ এ সময় নির্মিত হয়। ১৫৩২ সালে নুসরাত শাহ আততায়ীর হাতে নিহত হন।

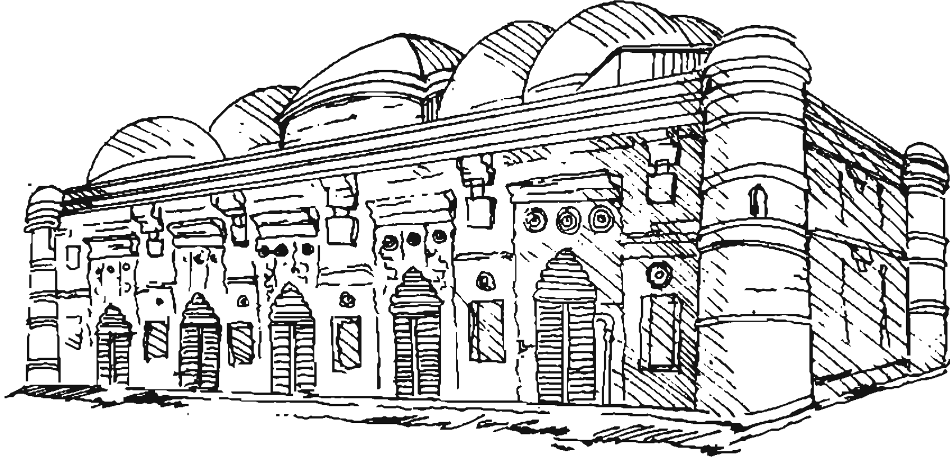
নুসরাত শাহের উত্তরাধিকারীগণ : নুসরাত শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁকে হত্যা করে তাঁর চাচা গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ সুলতান হন। আফগান নেতা শের খান তখন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। শের খানের সাথে মাহমুদের মনোমালিন্য ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। ১৫৩৮ সালে শের খান বাংলা আক্রমণ করে গৌড় অধিকার করেন। মাহমুদ শাহ হুমায়ুনের নিকট আশ্রয় নেন। হুমায়ুনের শিবিরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এভাবে ১৩৩৮ সালে স্থাপিত বাংলার স্বাধীন সুলতানী দুইশ বছর পর ১৫৩৮ সালে শেষ হয়।

হুসাইন শাহী যুগের কৃতিত্ব : রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বাংলায় গুরুত্ব : হুসাইন শাহী বংশ প্রায় ৪৫ বছর বাংলা শাসন করেছে। এ সময় বাংলার রাজ্যসীমা বাংলার বাইরেও বিস্তৃত হয়। বাংলা ছিল তখন ভারতের পূর্বাঞ্চলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলা তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। পর্তুগীজগণ চেষ্টা করেও এদেশে ঘাঁটি স্থাপন করতে পারেনি। অবশ্য এই বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহ পর্তুগীজদের কয়েকটি স্থানে ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কাজটি তিনি করেছিলেন পর্তুগীজদের সাহায্য পাওয়ার আশায়। আফগানদের শত্রুতা থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য। এ সাহায্য তাঁর প্রয়োজন ছিল।

আর্থিক প্রাচুর্য : এ যুগে বাংলার সামরিক গৌরব যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে এর ধন–সম্পদ। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। ফলে কৃষি কাজ, শিল্প ও ব্যবসা–বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

শিল্প সংস্কৃতি : কোন দেশে প্রাচুর্য থাকলে সে দেশের শিল্প সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। হুসাইন শাহী আমলে বাংলার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এ যুগে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির খুব উন্নতি হয়। হুসাইন শাহ ও নুসরাত শাহ কবি সাহিত্যিকদের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, যশোরাজ খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রমুখ ছিলেন এ যুগের প্রধান প্রধান কবি–সাহিত্যিক।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : ধর্মীয় সহিষ্ণুতা হুসাইন শাহী যুগের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য। সুলতানগণ কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মের বিচার করতেন না, গুণের কদর করতেন। এ যুগে বহু হিন্দু উচ্চ রাজকার্যে নিয়োগ পেয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এ যুগকে নতুন মহিমা দান করেছিল। ভক্তি মতবাদ এবং এ সম্পর্কিত সাহিত্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল।



চিত্র ৪.২ : ছোট সোনা মসজিদ

স্থাপত্য শিল্প : এ যুগে স্থাপত্য শিল্পেরও উন্নতি হয়। অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ এ যুগে নির্মিত হয়। ছোট সোনা মসজিদ, কদম রসুল মসজিদ, দশ গম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি এ যুগের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। হুসাইন শাহী শাসনামল মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলার কোন সুলতান ন্যায় বিচারের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন?
   - ক. হামজা শাহ
   - খ. ইলিয়াস শাহ
   - গ. ফখরুউদ্দিন মুবারক শাহ
   - ঘ. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ – ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ফখরুউদ্দিন মুবারক শাহের শাসনামল ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সময় বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা এদেশে ভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায় তখন সুফী দরবেশদের খুব সম্মান ছিল, হাট বাজারের দাস–দাসী ক্রয়–বিক্রয় হত ইত্যাদি।

২. ইবনে বতুতা কোন দেশের পর্যটক ছিলেন–

ক. ইরান খ. ইরাক

গ. মরক্কো ঘ. সুদান

৩. বাংলাদেশ সম্পর্কে ইবনে বতুতার মূল্যায়ন–

i. এখানে প্রচুর চাল পাওয়া যায়

ii. খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত কম

iii. প্রচুর লোক নৌপথে চলাচল করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. ইবনে বতুতা বাংলাকে ভাল জিনিসে পরিপূর্ণ দোজখ বলেছেন কেন?

ক. বাজারে দাস–দাসী বিক্রির কারণে

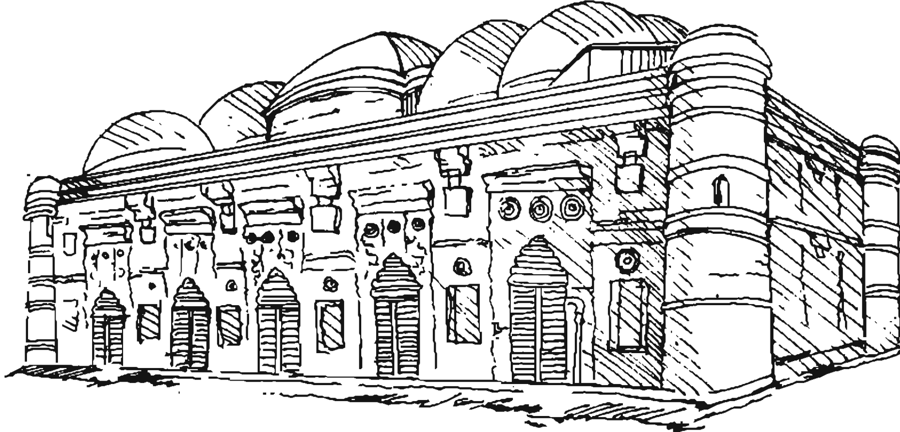
খ. দরবেশের আধিক্যের কারণে

গ. মন্দ আবহাওয়ার কারণে

ঘ. অসংখ্য নদ–নদী থাকার কারণে

সৃজনশীল প্রশ্ন

চিত্রটি লক্ষ্য কর ঃ



ক. চিত্রে প্রদর্শিত ছোট সোনা মসজিদ কোন যুগে স্থাপিত হয়?

খ. ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঐ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রটির আলোকে ঐ যুগের স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

ঘ. যুগটি ছিল মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময়–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে মুঘল শাসন

আকবরের বিজয়ের পূর্বে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবুর। বাবুরের আমলে বাংলা বিজিত হয়নি। বাংলার সুলতান নুসরাত শাহের সাথে তিনি সম্মানজনক সন্ধি করেছিলেন। হুমায়ুন ১৫৩৮ সালে গৌড় দখল করেছিলেন। কিন্তু কনৌজের যুদ্ধের পর শেরশাহ বাংলার মুঘল প্রশাসক জাহাঙ্গীর কুলিকে পরাজিত করে বাংলাকে শূর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন (১৫৪০ সাল)। আকবর বাংলা জয় করেন ১৫৭৬ সালে। ১৫৪০ থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত শাসনামলকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। বাংলাদেশে শূর শাসন এবং বাংলাদেশে কররানী শাসন।

বাংলাদেশে শূর শাসন : ১৫৪০ থেকে ১৫৫৩ সাল পর্যন্ত বাংলা দিল্লির অধীন ছিল। এ সময় দিল্লির সুলতান ছিলেন শের শাহ ও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ। ১৫৫৩ সালে ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর আফগান দলপতিদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এর ফলে খন্ড বিখন্ড হয় শূর সাম্রাজ্য। মুহম্মদ শাহ শূর বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ বিশৃংখলার সুযোগে আরাকানের রাজা মেং বেং চট্টগ্রাম দখল করে নেন। মুহম্মদ শাহ চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন। ১৫৫৫ সালে মুহম্মদ শাহ নিহত হন। তখন বাংলার সিংহাসনে বসেন তার পুত্র বাহাদুর শাহ। ১৫৬০ সালে বাহাদুর শূরের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাই জালাল শাহ শূর। ১৫৬০ থেকে ১৫৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলায় চরম রাজনৈতিক বিশৃংখলা চলেছিল। জালাল শাহের পুত্রকে হত্যা করে গিয়াসউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি বাংলার সিংহাসনে বসেন। এভাবে বাংলাদেশে শূর শাসনের অবসান হয়।

বাংলাদেশে কররানী শাসন : তাজখান কররানী ছিলেন বাংলাদেশে কররানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কররানীগণ জাতিতে আফগান। তাজখান কররানী ও তাঁর ভাই সোলায়মান কররানী শের শাহের সেনাপতি ছিলেন। ইসলাম শাহের সময় তাঁদের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ১৫৬৪ সালে গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত করে তাজখান বাংলার সিংহাসনে বসেন। অল্পদিন রাজত্ব করার পর তাজ খানের মৃত্যু হয়। তখন সিংহাসনে বসেন সোলায়মান কররানী। সোলায়মান খুব দক্ষ শাসক ছিলেন। বাংলা ও বিহারের অধিকাংশ স্থান তাঁর দখলে ছিল। পুত্র বায়জিদ ও সেনাপতি কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে তিনি উড়িষ্যাও দখল করেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিজ্ঞ। তিনি আকবরের প্রতি মৌখিক আনুগত্য জানান এবং তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ১৫৭২ সালে সোলায়মানের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র বায়জিদ বাংলা–বিহার–উড়িষ্যার পরবর্তী সুলতান হন। বায়জিদ ছিলেন অত্যাচারী শাসক। তাই তাঁকে সরিয়ে আমীরগণ তাঁর ছোট ভাই দাউদ খান কররানীকে সুলতান পদে বসান।

আকবরের বাংলা বিজয় : দাউদ কররানী ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির। তিনি আকবরের প্রতি আনুগত্য জানাতে অস্বীকার করেন। তিনি নিজেকে আকবরের সমকক্ষ মনে করতেন। ফলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। গুজরাট বিজয়ের পরই আকবর বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খান খান–ই–খানানকে বিহার আক্রমণের নির্দেশ দেন।

মুনিম খান বিহার আক্রমণ করেন। ওয়াজির খান লোদীর পরামর্শে দাউদ কররানী মুনিম খানের সাথে সন্ধি করেন।

পাটনা দখল : কিন্তু আকবর এ সন্ধি অনুমোদন করেননি। তাই মুনিম খান আবার বিহার আক্রমণ করেন। ইতোমধ্যে ওয়াজির লোদীকে মিথ্যা সন্দেহে ফাঁসি দেওয়া হয়। ওয়াজির লোদী ছিলেন মুনিম খানের বন্ধু। তাঁর মৃত্যুর পর বিহার জয় করায় মুনিম খানের আর কোন দ্বিধা রইল না। দাউদ খান পাটনা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে আকবর নিজেই এসেছিলেন বিহার জয়ে অংশ নিতে। তিনি পাটনায় গঙ্গা নদীর অপর তীরে হাজিপুর দখল করেন। সেখান থেকে পাটনা দুর্গে রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে দাউদ খান পাটনা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হন। আকবর পাটনা দখল করে নেন। মুনিম খানের ওপর পরবর্তী যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে আকবর রাজধানীতে ফিরে যান।

তুকারয়ের যুদ্ধ (১৫৭৫) : বাংলায় কররানীদের রাজধানী ছিল তান্ডায়। মুনিম খান তান্ডা আক্রমণ করে তা দখল করেন। দাউদ খান সপ্তগ্রামে চলে যেতে বাধ্য হন। মুঘলগণও সপ্তগ্রামের দিকে এগিয়ে আসে। দাউদ খান তখন উড়িষ্যায় চলে যান। মুনিম খান তাঁকে উড়িষ্যাতেও ধাওয়া করেন। ১৫৭৫ সালে তুকারয়ের যুদ্ধে দাউদ খান মুনিম খানের নিকট পরাজিত হন এবং মুনিম খানের সাথে আবার সন্ধি করেন। এটি কটকের সন্ধি নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তানুসারে দাউদ খান আকবরের অধীনে শুধু উড়িষ্যার শাসক হিসেবে থাকতে রাজি হন। মুনিম খান তান্ডায় ফিরে আসেন। সেখানে তিনি বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন।

দাউদ খানের উত্তর ও পশ্চিম বাংলা পুনর্দখল : এ বছর তান্ডায় প্লেগ রোগ দেখা দেয়। বহু মুঘল সৈন্য এ রোগে মারা যায়। স্বয়ং মুনিম খানও মারা যান। মুঘল বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ বিশৃঙ্খলার সুযোগে দাউদ খান আবার উত্তর ও পশ্চিম বাংলা দখল করে নেন।

রাজমহলের যুদ্ধ (১৫৭৬ সাল) : মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ আগ্রায় পৌঁছলে হুসেন কুলি খান খান–ই–জাহানকে সম্রাট বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। টোডরমলকে করা হয় তাঁর সহকারি। বিহারের শাসনকর্তা মুজাফফর হোসেন তুরবতীকে নির্দেশ দেওয়া হয় তাদের সাহায্য করতে। এ শক্তিশালী মুঘল বাহিনীর সাথে ১৫৭৬ সালে রাজমহলের নিকট দাউদ খানের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দাউদ খান পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। এভাবে বাংলায় কররানী শাসনের অবসান হয়। আর সূত্রপাত হয় মুঘল শাসনের।

বাংলার বার ভুঁইয়া : আকবর বাংলা দখল করলেও পুরো বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদারগণ মুঘল শাসন মেনে নেননি। মুঘলদের বিরুদ্ধে তারা প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁদের শক্তিশালী সৈন্যদল ও নৌবহর ছিল। অনেক সময় তাঁরা একজোট হয়ে মুঘলদের আক্রমণ করতেন। বাংলার এ জমিদারগণ বার ভুঁইয়া নামে পরিচিত। বার বলতে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাত।

সোনারগাঁওয়ের ঈসা খান ও মুসা খান : বাংলার বার ভুঁইয়াদের নেতা ছিলেন সোনারগাঁওয়ের ঈসা খান ও তাঁর পুত্র মুসা খান। ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঈসা খানের শাসনাধীনে ছিল। ১৫৯৭ সালে আকবরের সেনাপতি ও বাংলার সুবাদার মানসিংহের সাথে ঈসা খানের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। ঈসা খান সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ১৫৯৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান ভুঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন।



চিত্র ৪.৩ : ঈসা খান

ভাওয়ালের গাজী পরিবার : শের খানের বাংলা জয়ের আগেই ভাওয়ালের গাজী পরিবারের জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফজল গাজী শের শাহের আমলে এক জন বড় জমিদার ছিলেন। তারপর বাহাদুর গাজী ভাওয়ালের জমিদার হন। গাজীদের শক্তিশালী নৌবহর ছিল।



চিত্র ৪.৪ : ঈসা খান ও মানসিংহের যুদ্ধ

মজলিস পরতাপ ও মজলিস কুতুব : ভাওয়াল সংলগ্ন ময়মনসিংহ অঞ্চলের দুইজন জমিদার ছিলেন মজলিস পরতাপ ও মজলিস কুতুব। মজলিস কুতুব পরে ফতেহাবাদে (ফরিদপুর) জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন।

করিমদাদ মুসা জাই দক্ষিণ সিলেটের, ইবরাহিম মোড়ল কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের এবং আনোয়ার খান বানিয়াচঙ্গের জমিদার ছিলেন। তাজ খান ও সলিম খান হিজলীর এবং শামস খান বীরভূমের জমিদার ছিলেন। মাসুম খান কাবুলী ঈসা খানের সহায়তায় পাবনা অঞ্চলে জমিদারি স্থাপন করেন।

ওসমান খান লোহানী উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে ঈসা খানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঈসা খানের সহায়তায় তিনি সিলেটের বুকাইনগরে জমিদারি স্থাপন করেন।

হিন্দু জমিদারদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের (বাকুড়া) বীহামির, চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল) পরমান্দ রায়, ভুলুয়ার (নোয়াখালি) লক্ষ্মণমানিক্য, যশোরের প্রতাপদিত্য, বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদার রায়, ভুষণার (ফরিদপুর জেলায়) মুকুন্দরাম ও তাঁর পুত্র সত্যজিৎ, শাহজাদপুরের (সিরাজগঞ্জ জেলায়) রাজা রায় এবং চন্দ্রপ্রতাপের (মানিকগঞ্জ) বিনোদ রায় ও মধু রায় প্রধান ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের বাংলা বিজয় : সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন করা সম্ভব হয়নি। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলে বার ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়।

ইসলাম খান (১৬০৮–১৬১৩)

বার ভূঁইয়াদের দমনের উদ্দেশ্যে জাহাঙ্গীর ১৬০৮ সালে ইসলাম খান চিশতিকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। ইসলাম খান ছিলেন অত্যন্ত চতুর। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসা খানকে দমন করতে পারলে অন্যান্য জমিদারগণ মুঘলদের অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হবেন। ইসলাম খান একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলেন।

ইসলাম খান ১৬০৯ সালের অক্টোবর মাসে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে পৌঁছেন। করতোয়া নদীর পূর্বতীরে যাত্রাপুরে মুসা খানের একটা দুর্গ ছিল। এখানে জমিদারদের মিলিত বাহিনীর সাথে ইসলাম খানের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জমিদারগণ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। তাঁরা পিছু হটেন। ইসলাম খান পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। পথে তিনি অনেক জমিদারকে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন। ১৬০৯ সালে তিনি ঢাকা পৌঁছেন। তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় সরিয়ে আনেন। ঢাকা থেকে মুসা খানের রাজধানী সোনারগাঁও খুব কাছে। তিনি ভাবলেন এখান থেকে মুসা খানকে দমন করা সহজ হবে। তাই তিনি রাজধানী সরিয়ে আনলেন। সম্রাটের নামানুসারে ঢাকার নতুন নাম দেওয়া হল জাহাঙ্গীরনগর।

জমিদারগণ তাঁদের নৌবাহিনী জমায়েত করেন শীতলক্ষা নদীতে। কিন্তু ইসলাম খানের নিকট এ মিলিত বাহিনীর পরাজয় হয়। বিজয়ী ইসলাম খান শীতলক্ষার পূর্বতীরে অবস্থিত মুসা খানের কদম রসুল ও আরও কয়েকটি দুর্গ দখল করে নেন। এরপর মুঘলগণ মুসা খানের রাজধানী সোনারগাঁও দখল করেন। তখন মুসা খানের পক্ষের জমিদারগণ একে

একে ইসলাম খানের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত মুসা খানও মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করে নেন। ইসলাম খান বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন। তিনি জমিদারগণকে তাঁদের স্ব স্ব জমিদারিতে মুঘলদের অধীনে জায়গিরদার নিয়োগ করেন।

মুসা খান আত্মসমর্পণ করায় যে সকল জমিদার তখনও পরাজিত হননি তাঁরাও নিরাশ হয়ে মুঘল আনুগত্য স্বীকার করে নেন। চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। যশোরের প্রতাপদিত্য প্রথমে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। পরে মুঘলদের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে ঢাকায় আনা হয়। বুকাইনগরের ওসমান খান বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। এভাবে বার ভূঁইয়াদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। সিলেট ও নোয়াখালি পর্যন্ত বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬১৩ সালে ইসলাম খানের মৃত্যু হয়।

মীর জুমলা (১৬৬০–১৬৬৩)

সুবাদার ইসলাম খানের মৃত্যুর পর বেশ কয়েক জন মুঘল সুবাদার বাংলা শাসন করেন। ১৬৩৯ সালে শাহজাদা সুজা বাংলার সুবাদার হন। ১৬৫৭ সালের শেষভাগে শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে সুজাও ছিলেন অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি প্রথমে দারার নিকট এবং পরে আওরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হন।

আওরঙ্গজেব সুজাকে অনুসরণ করার দায়িত্ব দেন সেনাপতি মীর জুমলার ওপর। সুজাকে অনুসরণ করে মীরজুমলা ঢাকা প্রবেশ করেন। ইতোমধ্যে সুজা আরাকান চলে যান। বাংলার আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে সুবাদার নিযুক্ত করেন।

শাসক হিসেবে মীর জুমলা : সুবাদার হয়েই মীর জুমলা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছিল। সুবাদার হিসেবে মীর জুমলা খুব দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি এক জন সুশাসক ছিলেন। তিনি মাত্র তিন বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। এ অল্প সময়ের বেশির ভাগ কাটে যুদ্ধবিগ্রহে। তবুও তিনি সুশাসন কায়েম করেন। তিনি নিজে প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনতেন। তিনি ছিলেন সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ।

কুচবিহার ও আসাম অভিযান : উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় কুচবিহারের প্রাণনারায়ণ মুঘল সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করেন। আসামের রাজা জয়ধ্বজও মুঘলদের সাথে শত্রুতা করা শুরু করেন। মীর জুমলা কুচবিহার জয় করে নেন। এরপর তিনি আসাম অভিযান করেন। আসামের রাজা পরাজিত হন। তিনি রাজধানী ত্যাগ করে দুর্গম অঞ্চলে পালিয়ে যান। ইতোমধ্যে বর্ষাকাল এসে যায়। মুঘলগণ তখন খুব অসুবিধায় পড়ে। মুঘল শিবিরে চরম খাদ্যাভাব হয়। মহামারী আকারে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। বহু মুঘল সৈন্য মারা যায়। বর্ষা শেষ হলে মীর জুমলা আবার আক্রমণ করেন। তখন আসামের রাজা মীর জুমলার সাথে সন্ধি করেন। রাজা ২০,০০০ তোলা সোনা ১,২০,০০০ তোলা রূপা এবং ৪০টি হাতি দিতে রাজি হন। আসামের এক জন রাজকন্যাকে বাদশাহর পুত্র আজমের সাথে বিয়ের জন্য দিল্লিতে পাঠানো হয়। এছাড়া রাজা বার্ষিক ২০টি হাতি কর হিসেবে দিতে স্বীকার করেন।

মীর জুমলা নৌপথে ঢাকা রওয়ানা হন। নারায়ণগঞ্জের কাছে খিজিরপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

শায়েস্তা খান (১৬৬৪–১৬৭৮ এবং ১৬৭৯–১৬৮৮)



চিত্র ৪.৫ : শায়েস্তা খান

মীর জুমলার পর বেশ কয়েক জন সুবাদার বাংলা শাসন করেন। এদের মধ্যে শায়েস্তা খান, মুর্শিদকুলি খান ও আলীবর্দী খান খুব বিখ্যাত ছিলেন।

শায়েস্তা খান দীর্ঘদিন বাংলার সুবাদার ছিলেন। মাঝখানে অল্প কিছু দিন তিনি বাংলার বাইরে ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা।

শায়েস্তা খান মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের দমন করেন। তিনি মগদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন চট্টগ্রামের নাম রাখা হয় ইসলামাবাদ। শায়েস্তা খান ফিরিঙ্গি দস্যুদের দমন করেন। তাঁর সুবাদারির শেষ দিকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথেও তাঁর বিবাদ শুরু হয়। শায়েস্তা খান ইংরেজদেরকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। শায়েস্তা খানের শাসনামলে বাংলার মানুষ খুব সুখে ছিল। কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা–বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। জিনিসপত্রের দাম খুব কম ছিল। শায়েস্তা খানের আমলে ১ টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।

শায়েস্তা খান এক জন বড় নির্মাতা ছিলেন। তিনি ছোট কাটরা নির্মাণ করেন। হুসেনী দালান এবং লালবাগ দুর্গের কয়েকটি প্রাসাদ ও সমাধিসৌধ তাঁর সময়ে নির্মিত হয়।



চিত্র ৪.৬ : লালবাগ কেল্লা

মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭–১৭২৭)

১৭০০ সালে মুর্শিদকুলি খান বাংলার দিউয়ান হয়ে আসেন। তিনি ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক জন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারি। তিনি সততা ও দক্ষতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

সম্রাট ফররুখশিয়ার ১৭১৭ সালে তাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। একই সাথে তিনি দিউয়ান পদেও বহাল থাকেন। দিউয়ান হিসেবে তিনি রাজস্ব আদায় করতেন, আর সুবাদার হিসেবে করতেন দেশ শাসন। দিল্লির সম্রাটদের

দুর্বলতার সুযোগে এ সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কার্যত স্বাধীন হয়ে পড়েন। মুর্শিদ কুলি খানও স্বাধীনভাবেই দেশ শাসন করতে থাকেন।

মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন। তিনি কর্মচারিদের জায়গিরগুলো সরকারের খাস জমিতে পরিণত করেন। তিনি ইজারাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন। তিনি ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। উৎপন্ন শষ্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য হয়।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সারা বাংলা ১৩টি চাকলায় বিভক্ত ছিল। মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব সংস্কারের জন্য ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। মুর্শিদকুলি খান শাসক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজাদরদী ছিলেন। তিনি শিক্ষিত ছিলেন। আলেম ও ধর্মপরায়ণ লোকজন তাঁর নিকট সমাদর পেতেন।

১৭২৭ সালের ৩০ জুন মুর্শিদকুলি খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান এরপর বাংলার সিংহাসনে বসেন। এভাবে বাংলার সুবাদারি বংশগত হয়ে যায়।


চিত্র ৪.৭ : মুর্শিদকুলি খান

আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬)

আলীবর্দী খান জাতিতে তুর্কী ছিলেন। প্রথম জীবনে ছিলেন তিনি অত্যন্ত দরিদ্র। সুজাউদ্দিনের অধীনে তিনি চাকরি গ্রহণ করেন। নিজ যোগ্যতায় তাঁর দ্রুত উন্নতি হয়। তিনি সুজাউদ্দিনের অধীনে বিহারের নায়েব নাজিম হন। সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সরফরাজ খান নবাব হন। তাঁকে ঘিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে ১৭৪০ সালে আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আলীবর্দী খান দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি প্রজাদের খুব ভালবাসতেন। তাঁর সময় মারাঠারা প্রায় প্রতি বছর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা আক্রমণ করত। মারাঠাদের আক্রমণকে বাংলার ইতিহাসে বর্গীর হাঙ্গামা বলা হয়। আলীবর্দী খান এদেরকে দমন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অবশেষে মারাঠাদের সাথে তাঁর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে নবাব মারাঠারদেরকে উড়িষ্যা শাসনের অধিকার ছেড়ে দেন। ফলে বাংলাদেশ মারাঠা আক্রমণ থেকে রেহাই পায়। আলীবর্দী খানের সময় আফগানরা বিদ্রোহী হয়। তিনি সে বিদ্রোহ দমন করেন।


চিত্র ৪.৮ : আলীবর্দী খান

আলীবর্দী খানের শাসনামলে ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ বণিকগণ বাংলায় ব্যবসা করত। তিনি এ বণিকদের নিকট থেকে শুল্ক ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আদায় করতেন না। কিন্তু তিনি তাদের উপর কড়া নজর রাখতেন। তাদের উপর তাঁর কর্তৃত্ব বজায় ছিল। আলীবর্দী খানের সুশাসনে প্রজারা সুখে শান্তিতে ছিল। ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল আলীবর্দী খান মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬–১৭৫৭)

আলীবর্দী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর তিন মেয়ের বিয়ে হয়েছিল তাঁর বড় ভাই হাজী আহমদের তিন ছেলের সাথে। ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের বিয়ে হয় জয়েন উদ্দিনের সাথে। তাঁদের সন্তান সিরাজউদ্দৌলাকে আলীবর্দী খান অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর এ আদরের দৌহিত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

মনোনয়ন অনুসারে সিরাজ সিংহাসনে বসলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। সিরাজ সিংহাসন লাভ করায় তাঁর বড় খালা ঘষেটি বেগম এবং দরবারের প্রভাবশালী আমীরগণ সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। ইংরেজগণ এ ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। এ ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল পলাশীর যুদ্ধে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ইংরেজদের সাথে পলাশীর ময়দানে নবাবের যুদ্ধ হয়। মীর মদন, মোহন লাল প্রমুখ দেশপ্রেমিক সৈনিক প্রাণপণ যুদ্ধ করলেও সেনাপতি মীর জাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, উমিচাঁদ এদের ন্যায় দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে নবাব পরাজিত ও নিহত হন।



চিত্র ৪.৯ : সিরাজউদ্দৌলা

ইংরেজদের সহায়তায় মীর জাফর মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু ইংরেজদের হাতেই চলে গেল মূল ক্ষমতা। এভাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা হারায়। এরই সাথে শেষ হয় বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পলাশীর যুদ্ধ সংগঠিত হয় কত সালে?

ক. ১৫৫৭

খ. ১৬৫৭

গ. ১৭৫৭

ঘ. ১৮৫৭

নিচের চিত্রটি দেখে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



২. চিত্রে প্রদর্শিত কেল্লাটি কোন সুবেদারের সময়কাল নির্দেশ করে?

ক. মীল জুমলার

খ. শায়েস্তা খানের

গ. মুর্শিদকুলি খানের

ঘ. আলীবর্দী খানের

৩. তাঁর আমলে ব্যবসায়–বাণিজ্যের

১. খুব অবনতি ঘটে

২. খুব সমৃদ্ধি ঘটে

৩. পথ উন্মোচিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. ii

ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হাসিনা তার ইতিহাস ক্লাশে শিক্ষককে প্রশ্ন করল, "স্যার আমরা শায়েস্তা খান ও মুর্শিদকুলি খানের মধ্যে কাকে দক্ষ সুবাদার বলতে পারি।" শিক্ষক বলার পূর্বেই শিহাব বললো, "মুর্শিদকুলি খানকে আমরা দক্ষ সুবাদার বলতে পারি।" মুর্শিদকুলি খানকে প্রথমে দিউয়ান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে এবং এই দায়িত্ব পালনের সময়ই তিনি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।"

ক. দিউয়ানের কাজ কী ছিল?

খ. সুবাদারগণ কীভাবে স্বাধীন হয়ে পড়েন।

গ. শিহাব কেন "মুর্শিদকুলি খানকে দক্ষ সুবাদার বলল ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব আদায়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপাদান ও কার্যাবলি

রাষ্ট্র

সাধারণভাবে রাষ্ট্র বলতে আমরা সরকার, দেশ, জনসমষ্টি ও জাতি বুঝি। পৌরনীতিতে রাষ্ট্র শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতামত থেকে আমরা রাষ্ট্রের একটি সহজ ও সাধারণ ধারণা পাই। যেমন– রাষ্ট্র এমন একটি জনসমষ্টি, যারা কোন একটি নির্দিষ্ট ভূ–খণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করে, যাদের একটি সংগঠিত সরকার আছে, যারা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং জনগণ স্বভাবতই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে। রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন।

রাষ্ট্রের উপাদান : নির্দিষ্ট ভূ–খণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা–এ চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়।

(১) জনসমষ্টি : মানুষ নিয়েই রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান উপাদান জনসমষ্টি। জনশূন্য রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্র একটি সংগঠন এবং যে কোনো সংগঠনের জন্য জনগণ দরকার। জনহীন মরুভূমি অথবা অরণ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্র গঠনের জন্য কত লোকের দরকার এ সম্পর্কে বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। জনসংখ্যা বেশিও হতে পারে, আবার কমও হতে পারে। যেমন, বাংলাদেশ জনবহুল রাষ্ট্র, আবার ভুটান জনবিরল রাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর মাঝে চীনের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। একশত কোটির অধিক। আমেরিকার জনসংখ্যা পঁচিশ কোটি। দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন, “কোন দেশের লোকসংখ্যা বেশি হওয়া ঠিক নয়, আবার কম হওয়াও ঠিক নয়। দেশের আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক।” বাংলাদেশের লোকসংখ্যা তার আয়তন ও সম্পদের তুলনায় অত্যধিক বেশি। প্রায় ১২.৯২ কোটি (আদম শুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট, আগস্ট, ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৬ লাখ (বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো ২০০৭)

(২) ভূ–খণ্ড : রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান ভূ–খণ্ড। জনগণের বসবাসের জন্য প্রয়োজন হয় একটি নির্দিষ্ট ভূ–খণ্ড। স্থায়ী ভূ–খণ্ড ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। যাযাবর জাতি রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। কারণ তারা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ভূ–খণ্ড বলতে নির্দিষ্ট স্থলভাগ, সমুদ্র সীমানা ও উপরের বায়ুমণ্ডলকে বোঝায়। ভূ–খণ্ডের কোন নির্দিষ্ট আয়তন নেই। কোনটি বড়, আবার কোনটি ছোট। নেদারল্যান্ড–এর আয়তন মাত্র ৩৩,৬৭০ বর্গ কিলোমিটার, কিন্তু ভারতের আয়তন প্রায় ৩২,৮৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশ প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। আয়তনের উপর রাষ্ট্রের শক্তি বা গৌরব নির্ভর করে না। মোট কথা রাষ্ট্রের একটি ভৌগোলিক সীমারেখা থাকে। ভূ–খণ্ডগুলো দ্বীপের সমষ্টিও হতে পারে। যেমন জাপান, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি।

(৩) সরকার : রাষ্ট্রের আরেকটি উপাদান হল সরকার। রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যারা নিয়োজিত থাকে তাদেরকে সরকার বলা হয়। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজ সম্পন্ন হয়, রাষ্ট্রের আইন বা বিধি–নিষেধ আরোপিত হয় এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। সরকার রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং জনগণের অধিকার

রক্ষা করে। সরকার জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, যেমন– শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা, ব্যবসা–বাণিজ্য ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি করে। সুসংগঠিত সরকারের অভাবে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশের সরকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

(৪) সার্বভৌমত্ব : রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হল সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও চরম ক্ষমতা বোঝায়। এর ওপরে আর কোনো ক্ষমতা নেই। এই ক্ষমতার দুইটি রূপ, একটি রাষ্ট্রের ভিতরে ও আরেকটি রাষ্ট্রের বাইরে ব্যবহার করা হয়। আদেশ দেওয়ার, আদেশ পালনে বাধ্য করার এবং আদেশ ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা সার্বভৌমত্বের ভিতরের রূপ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও হস্তক্ষেপ থেকে দেশকে মুক্ত রাখার ক্ষমতা এর বাহ্যিক রূপ। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা অখণ্ড ও তুলনাবিহীন। কেবলমাত্র ভূ–খণ্ড, জনসমষ্টি ও সরকার থাকলেই রাষ্ট্র হয় না। এগুলোর সাথে সার্বভৌমত্ব যোগ হলে তবেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা, নিউইয়র্ক, লন্ডন, লাহোর, দিল্লি পশ্চিম বাংলা প্রভৃতি রাষ্ট্র নয়, কারণ এগুলোর সার্বভৌমত্ব নেই।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি

রাষ্ট্র একটি মানবীয় সংগঠন। মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের কাজ। রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা ছাড়াও আধুনিক রাষ্ট্রগুলোকে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হয়। অতীতে রাষ্ট্রের যেরূপ আদর্শ ছিল বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটেছে। আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজের প্রকৃতিও বিভিন্ন। যুগের এবং সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রের কাজেরও পরিবর্তন হচ্ছে। পূর্বে যে কাজকে মুখ্য বলে বিবেচনা করা হত আজকের রাষ্ট্রে সে কাজকেই গৌণ মনে করা হচ্ছে। জন স্টুয়ার্ট মিল–এর মতে, "রাষ্ট্রের কাজকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া চলে না, বিভিন্ন রাষ্ট্রে এটি বিভিন্ন হয়।"

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়;
(১) মৌলিক বা অপরিহার্য কাজ,
(২) ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজ।

মৌলিক বা অপরিহার্য কাজ : রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য যে কাজ অবশ্যই সম্পাদন করতে হয়, তাকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ বলে। এগুলো হল–

(ক) আইন প্রণয়ন : রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রের সংবিধান বা মৌলিক দলিল অনুযায়ী আইন তৈরি করা। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, আয়–ব্যয়, দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে আইন রাষ্ট্র আইনসভার মাধ্যমে তৈরি করে থাকে।

(খ) শাসনকার্য পরিচালনা করা : এটা রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। শাসন বিভাগ নামে রাষ্ট্রের একটি শক্তিশালী বিভাগ আছে। এই বিভাগ রাষ্ট্রের আইনকে সঠিকভাবে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে।

(গ) সুবিচারের ব্যবস্থা করা : রাষ্ট্রে একটি বিচার বিভাগ বা আইন আদালত ও বিচারক থাকেন। রাষ্ট্র আইন আদালতের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণের জন্য সুবিচারের বন্দোবস্ত করে। এতে অন্যায়কারী সাজা পায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোক ক্ষতিপূরণ লাভ করে।

(ঘ) শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা : দেশের ভিতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের অন্যতম অপরিহার্য কাজ। নাগরিকদের জীবন ও ধন সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য রাষ্ট্র পুলিশ ও আনসার বাহিনী নিয়োগ করে থাকে। এদের সাহায্যে রাষ্ট্র

নাগরিকদের অধিকার টিকিয়ে রাখে। বাংলাদেশে বিডিআর, পুলিশ, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ইত্যাদি নিরাপত্তা বিধানকারী সংস্থা রয়েছে।

(ঙ) প্রতিরক্ষা বা বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা : জাতীয় নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা রাষ্ট্রের আরেকটি অপরিহার্য কাজ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। এ জন্য আধুনিককালে প্রতিটি রাষ্ট্রেরই আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনী সমন্বয়ে গঠিত প্রতিরক্ষা বাহিনী থাকে।

(চ) কর ও রাজস্ব আদায় : রাষ্ট্রের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা রাষ্ট্রের একটি মুখ্য কাজ। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পণ্যসামগ্রী এবং উপার্জিত ও অর্জিত সম্পত্তির উপর কর ও রাজস্ব বসিয়ে রাষ্ট্র এ অর্থ উপার্জন করে থাকে। কর ও রাজস্ব আদায়কারী সংস্থা বা বিভাগকে রাজস্ব বোর্ড বলা হয়। বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নামে একটি বিভাগ রয়েছে।

ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজ : বর্তমান বিশ্বে নাগরিকদের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র বহুবিধ কল্যাণধর্মী কাজ করে থাকে। এগুলো রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা জনকল্যাণমূলক কাজ। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান যুগে সমাজের মঙ্গল সাধন ও উন্নতি বিধানই রাষ্ট্রের কাজ। এ জন্য অনেক আধুনিক রাষ্ট্রকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা হয়। এসব রাষ্ট্র নাগরিকদের সর্বনিম্ন প্রয়োজন– অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা পূরণে ও নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সদা তৎপর। সেবাই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মহান আদর্শ। রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজগুলো নিচে আলোচনা করা হল।

(ক) শিক্ষা বিস্তার : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতি দেশের গৌরব ও প্রধান সম্পদ। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। শিক্ষা ব্যক্তিকে তার অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। শিক্ষা নাগরিকদের মাঝে দেশপ্রেম, কর্মপ্রেরণা ও আত্মনির্ভরশীলতা জাগায়। এ জন্য রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয় এবং প্রয়োজনীয় স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়া পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজও রাষ্ট্রের সহায়তায় হয়ে থাকে।

(খ) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ : স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সুস্বাস্থ্য মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। আধুনিককালে প্রতিটি রাষ্ট্রই নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছে। রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি, উন্নত চিকিৎসা, ওষুধপত্র সরবরাহ, হাসপাতাল তৈরি ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকে। 'কাউকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেওয়া হবে না'–এটা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উত্তম স্বাস্থ্যের জন্য রাষ্ট্র তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিষেধক টিকা ও ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এছাড়া তাদের আমোদ প্রমোদের জন্য খেলাধুলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি তৈরি করে।

দেশের গ্রাম, শহর–বন্দরে যাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকে, জনগণের সুচিকিৎসা হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগের ওপর চিকিৎসা, হাসপাতাল ও ওষুধপত্রের দায়িত্ব ন্যস্ত। পৌরসভা, পৌর এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, মশামাছি নির্মূল করা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব পালন করে।

(গ) কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন : একটি দেশের অগ্রগতি তার কৃষি ও শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। তাই কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ জন্য রাষ্ট্র কৃষকদের কাছে উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ ও আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ করে। এছাড়া কৃষকদের কৃষি ঋণ, গভীর নলকূপ, পাম্পমেশিন ইত্যাদি দিয়েও সাহায্য করে।

বস্তুত কৃষি ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বড় ও ভারী শিল্পকারখানা স্থাপন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার সম্ভব। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্র কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এভাবে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুধুমাত্র জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় চাহিদাই পূরণ হয় না দেশের অনেক লোকের কর্মসংস্থানও হয়ে থাকে। এশিয়া মহাদেশে জাপান এভাবেই বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী দেশে পরিণত হয়েছে।

(ঘ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দেশে শিক্ষার প্রসার, রাষ্ট্রীয় খবরাখবর প্রচার; নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দ্রুত সরবরাহ সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে প্রধানত দেশের জল, স্থল ও আকাশ পথে চলাচলকেই বোঝায়। চলাচলের মাধ্যম প্রধানত রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, লঞ্চ, স্টিমার, বিমান, সাইকেল, রিকশা, নৌকা ইত্যাদি। আবার ডাক, তার, রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশনও এর মাঝে পড়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবী আজ মানুষের কাছে ছোট হয়ে আসছে। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে যেমন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব, তেমনি দক্ষ প্রশাসন পরিচালনা, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাসহ জনগণের জীবনযাত্রা সহজসাধ্য ও আরামপ্রদ হয়ে ওঠে। আমাদের দেশেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে উন্নত সড়ক ব্যবস্থা, রেললাইন ও বিমানপথ রয়েছে। এছাড়া নদী ও সমুদ্রে বড় বড় নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ, স্টিমার ইত্যাদি চলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটিতে রাষ্ট্র গঠনের দুর্লভ উপাদানটি রয়েছে?

ক. ভূখণ্ড, জনসমষ্টি   খ. জনসমষ্টি, সরকার

গ. সার্বভৌমত্ব, জনসমষ্টি   ঘ. সরকার, ভূখন্ড

২. রাষ্ট্রকে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে হয়। যেমন–

i. আইন প্রণয়ন

ii. জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ

iii. শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও ii

গ. i ও iii   ঘ. ii ও iii

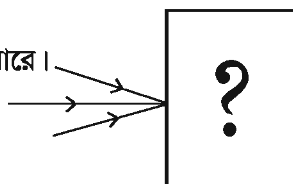
নিচের ডায়গ্রামটি দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাষ্ট্রের একটি চরম ক্ষমতা রয়েছে যার বলে–

i. যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আদেশ দিতে পারে।

ii. আদেশ পালনে বাধ্য করতে পারে।

iii. বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে।



৩. '?' চিহ্নিত স্থানে কী হবে?

ক. সরকার   খ. জনসমষ্টি

গ. সার্বভৌমত্ব   ঘ. ভূখণ্ড

৪. সিলেটকে কী কারণে রাষ্ট্র বলা যায় না?

ক. ভূখণ্ড আছে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা নেই   খ. জনসমষ্টি আছে কিন্তু প্রতিরক্ষা বাহিনী নেই

গ. জনসমষ্টি আছে কিন্তু সরকার নেই   ঘ. ভূখণ্ড আছে কিন্তু সরকার নেই

৫. একটি দেশের অগ্রগতি কীসের ওপর নির্ভরশীল?
ক. কৃষি ও শিল্পের ওপর খ. কর ও রাজস্ব আদায়ের ওপর
গ. আইন প্রণয়নের ওপর ঘ. সুবিচারের ওপর

৬. রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন–
i. বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন
ii. আইনের বাস্তব প্রয়োগ
iii. শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিম মিয়া একজন সফল চাষী। সে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় বীজ, সার, কীটনাশক নিয়ে ফসল উৎপাদন করে। সে কৃষি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে পায়।

৭. রাষ্ট্র কৃষকদের কাছে সরবরাহ করে–
i. উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক
ii. আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম
iii. গভীর নলকূপ ও পাম্প মেশিন

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮. রহিম মিয়া উন্নত চাষাবাদের জন্য কোন যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল?
ক. মোটরগাড়ি খ. রেলগাড়ি
গ. টেলিভিশন ঘ. নৌকা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আমরা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে বসবাস করি। এদেশের নাগরিক আলফাজ সাহেব চাকুরিজীবী। তিনি খুলনায় বসবাস করেন। সেখানে তার যথেস্ট সম্পদ রয়েছে। জনশ্রুতি আছে অবৈধভাবে তিনি এ সম্পদ অর্জন করেছেন। একদিন ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে।
ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? খ. খুলনা রাষ্ট্র নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. আলফাজ সাহেবকে শাস্তি দেওয়া রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. এ ধরনের অপরাধ কমানোর জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় মতামত দাও।

২. দবির মিয়া তার নিজের জমিতে একটি বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তার প্রতিবেশী করিম মিয়া হঠাৎ করেই উক্ত জমির মালিকানা দাবি করে একটি সাইনবোর্ড লাগায়। যার প্রেক্ষিতে দবির মিয়া গ্রাম্য মাতব্বরের কাছে যায় কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করতে গেলে কর্তৃপক্ষ আমলে না নেওয়ায় সে আদালতের শরণাপন্ন হয়। বস্তুত: আইন প্রণয়ন ও সুবিচার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ।

ক. দবির মিয়ার সার্বিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব কার?
খ. রাষ্ট্রের একটি প্রধান কাজ বর্ণনা কর।
গ. দবির মিয়া কীভাবে সুবিচার পেতে পারেন বর্ণনা কর।
ঘ. আইনের সঠিক প্রয়োগই রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করে–বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাগরিকতা, সুনাগরিকের গুণাবলি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

নাগরিকতা

পৌরনীতি নাগরিক হিসেবে মানুষের কার্যাবলি আলোচনা করে। এ জন্য একে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

সাধারণভাবে নগরের অধিবাসীদের নাগরিক বলা হয়। অতীতে গ্রীসের নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক সভ্যতা। সেই নগর–রাষ্ট্রের শাসনকার্যে যারা অংশগ্রহণ করত, তাদের বলা হত নাগরিক। কিন্তু বর্তমানে নাগরিকতার ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তির পদমর্যাদাই নাগরিকতা। কারণ রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে তাকে কতগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং রাষ্ট্রের অধিকার ভোগেরও সে অংশীদার হয়। আধুনিককালে নাগরিক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি একটি রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত, রাষ্ট্রের নিকট থেকে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন। অধ্যাপক লাস্কির মতে, ‘সর্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির বিচার বুদ্ধির সুষ্ঠু ব্যবহারের সুযোগই নাগরিকতা।’ সহজভাবে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

(ক) রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া।
(খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা।
(গ) রাষ্ট্র থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা।
(ঘ) রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা।

বর্তমানে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নাগরিকতার পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন– বাংলাদেশের নাগরিক, ভারতের নাগরিক, যুক্তরাজ্যের নাগরিক ইত্যাদি।

সুনাগরিকের গুণাবলি

মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজ জীবনকে সুন্দর ও সফল করে তুলতে পারে এক জন আদর্শ বা উত্তম নাগরিক। সুনাগরিকের তিনটি গুণ থাকতে হবে। যথা– বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক। লর্ড ব্রাইস বলেন, “সেই ব্যক্তি সুনাগরিক যে বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী ও বিবেকসম্পন্ন।” নিচে সুনাগরিকের গুণগুলো আলোচনা করা হল।

(ক) বুদ্ধি : বুদ্ধিমান নাগরিক যেকোন রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের জটিল সমস্যাগুলো বুঝতে পারে ও তার সহজ সমাধান করতে পারে। সুতরাং নাগরিকদের শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধি সরকারের সফলতা আনে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এর প্রয়োজন আরও বেশি।

(খ) আত্মসংযম : সুনাগরিকের আত্মসংযম থাকা উচিত। সরকারকে মেনে চলার অভ্যাস ও অন্যের মতামতকে গ্রহণ করার মনোভাব না থাকলে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা যায় না। এছাড়া রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের দোষ এড়িয়ে চলতে হয়।

(গ) বিবেক : প্রত্যেক সুনাগরিকের বিবেক, কর্তব্য জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সততার সাথে কর্তব্য পালন করার জন্য বিবেকসম্পন্ন নাগরিকের প্রয়োজন। বিবেকবোধ নাগরিকদের অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

অধিকার : অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। নাগরিকদের প্রতি প্রদত্ত অধিকার দ্বারা একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি বোঝা যায়।

সাধারণভাবে অধিকার বলতে মানুষের ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। কিন্তু পৌরবিজ্ঞানে অধিকার শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। অধ্যাপক লাস্কির মতে, "অধিকার হল সেসব সুযোগ সুবিধা যা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য আবশ্যক এবং সমাজ ও দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত।" আজকাল এসব সুযোগ সুবিধাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করা হয়েছে। অধিকারকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা– (১) নৈতিক অধিকার ও (২) আইনগত অধিকার।

নৈতিক অধিকার : নৈতিক অধিকার মানুষের নীতিবোধ ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়ার বা অসহায়ের সাহায্য পাওয়ার অধিকার। এ অধিকার রাষ্ট্রের আইন দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। এ অধিকার ভঙ্গকারীকে সমাজ সমালোচনা ও নিন্দা করতে পারে কিন্তু দেশের আইন তাকে কোন শাস্তি দিতে পারে না।

আইনগত অধিকার : যে অধিকার রাষ্ট্রের আইন দ্বারা অনুমোদিত তাকে আইনগত অধিকার বলে। কেউ এ অধিকার ভঙ্গ করলে তাকে আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে হয়। আইনগত অধিকার দুইভাগে বিভক্ত– (ক) সামাজিক অধিকার ও (খ) রাজনৈতিক অধিকার।

(ক) সামাজিক অধিকার : নাগরিকদের সভ্য, সুন্দর জীবন–যাপন এবং সামাজিক নিরাপত্তা লাভের জন্য সামাজিক অধিকারগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন। এ অধিকারগুলোও নানারকম। এগুলো নিচে উল্লেখ করা হল–

১. জীবনধারণের অধিকার : এটি হল নাগরিকদের প্রথম ও প্রধান অধিকার এবং সর্ব অধিকারের ভিত্তি। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

২. সম্পত্তির অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার আছে। কেউ যাতে কারও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করে বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হয়, রাষ্ট্র সেদিকে কঠোর নজর রাখে।

৩. চলাফেরা, সমাবেশ ও সমিতি করার অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকের নিজ দেশের অভ্যন্তরে অবাধে চলাফেরা, সমাবেশ ও সমিতি করার স্বাধীনতা আছে। এ অধিকার কেউ খর্ব করতে পারে না। তবে দেশে গোলযোগ বা যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের স্বার্থে সাময়িকভাবে এ অধিকারগুলো খর্ব বা রহিত করা যায়।

৪. ধর্ম চর্চার অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকের খুশিমত ধর্মকর্ম করার অধিকার আছে। ধর্ম ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার। রাষ্ট্র বা অন্য কেউ কোন ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ বা আঘাত করতে পারে না।

৫. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার : সামাজিক জীবনে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু শিক্ষা নাগরিকদের চিন্তা ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করে আর সুস্বাস্থ্য যোগায় প্রেরণা ও শক্তি। এ দুটোর অধিকার নাগরিকের জন্য অত্যাবশ্যক।

৬. পরিবার গঠনের অধিকার : মানুষ পরিবারে বাস করে। পরিবার গঠনের অধিকার বলতে আমরা নাগরিকদের বিয়ে করা, সন্তান পালনের ও পূর্বপুরুষের সম্পত্তি লাভের অধিকার বুঝি। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ এ অধিকার ভোগ করে আসছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকদের এই অধিকার দান করে পারিবারিক জীবনের সুস্থতা রক্ষা করা।

৭. কর্ম লাভের ও সামাজিক, অর্থনৈতিক সুবিচারের অধিকার : এ অধিকার বলতে আমরা বুঝি যে, যোগ্যতানুসারে প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থান থাকা উচিত এবং বৃদ্ধ, অক্ষম ও দরিদ্র লোকদের অসহায়ত্ব দূর করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাহায্যের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৮. চিন্তা, মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার : চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের নৈতিক উন্নতি হয় না। যারা চিন্তাশীল নয়, তারা সুনাগরিক হতে পারে না। এ অধিকার ব্যতিত নাগরিকদের মনুষ্যত্ব ও বিবেকের বিলোপ ঘটে। সংবাদপত্র মতামত ও চিন্তা প্রকাশের বাহনস্বরূপ। সুতরাং চিন্তা, মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৯. ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার : ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার ব্যতীত কোন জাতি বা সম্প্রদায় তাদের নিজস্বতা বজায় রাখতে পারে না। কাজেই জাতি, ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেককে তার নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার অধিকার দিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে যত্নবান হতে হবে।

(খ) রাজনৈতিক অধিকার : যে অধিকার বলে নাগরিকগণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। এ অধিকারও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এগুলো নিম্নরূপ :

১. বসবাসের অধিকার : রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তা নষ্ট না করে যেকোন নাগরিক রাষ্ট্রের ভেতরে যেকোনো স্থানে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে বাস করতে পারে। এতে রাষ্ট্র কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

২. ভোট দানের অধিকার : এ অধিকারের অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি নাগরিক তার ভোট দানের মাধ্যমে সরকার পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে কিংবা নিজেও নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য এটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার।

৩. আবেদন করার ও সরকারের সমালোচনা করার অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকের নিজের অভাব অভিযোগ ও সমস্যা জানাবার ও তার প্রতিবাদের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে লিখিত আবেদন পেশ করার অধিকার আছে। এছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা করার অধিকারও প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে।

৪. প্রবাসে নিরাপত্তা লাভের অধিকার : যেকোন নাগরিক বিদেশে অবস্থানকালে বিপদে বা সমস্যায় নিজ রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য প্রার্থনা বা নিরাপত্তা দাবি করতে পারে।

৫. সরকারি চাকরি লাভের অধিকার : জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, বংশ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের যোগ্যতানুসারে সরকারের যেকোন বিভাগ বা দপ্তরে চাকরি লাভ করার অধিকার আছে।

নাগরিকদের কর্তব্য : অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। নাগরিক যেমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে কতগুলো অধিকার লাভ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তার কতগুলো কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। নাগরিক জীবন স্বার্থক ও সুন্দর করার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের এসব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা উচিত। নিজ কর্তব্য পালন না করলে অধিকার ভোগ করা যায় না। নিচে নাগরিকদের প্রধান প্রধান কর্তব্যগুলো উল্লেখ করা হল।

(১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য : নিঃশর্তভাবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমিকতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রতিটি নাগরিকের যথার্থ ভূমিকা পালন করা উচিত।

(২) আইন মেনে চলা : নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণের জন্যই আইন তৈরি হয়। আইনের প্রতি সম্মান দেখানো প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। সুসভ্য জীবন যাপনের জন্য এবং দেশের উন্নতি ও শান্তির জন্য আইন মেনে চলা উচিত। আইন না মানলে রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

(৩) নিয়মিত কর প্রদান : রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার হয়। রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছ থেকে কর গ্রহণের মাধ্যমে সে অর্থ সংগ্রহ করে। কাজেই রাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নাগরিকদের স্বেচ্ছায় যথাসময়ে সরকারকে কর প্রদান করা কর্তব্য।

(৪) সরকারি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন : সরকারি কাজে সরকারকে সততার সাথে সহযোগিতা করা নাগরিকের কর্তব্য। কারণ সরকারি কাজ মানে জনগণের কাজ। যাদের উপর এ কাজের ভার ন্যস্ত হয়, তাদের সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা উচিত।

(৫) ভোটাধিকার ব্যবহার করা : সততা ও বিবেচনার সাথে ভোট দেওয়া নাগরিকদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিকে ভোট দিলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে।

(৬) সন্তানদের শিক্ষাদান ও রাষ্ট্রের সেবা করা : সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সন্তান ও আত্মীয় পরিজনদের শিক্ষাদান করা নাগরিকদের কর্তব্য। শিক্ষার মাধ্যমেই জাতীয় উন্নতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এছাড়াও রাষ্ট্রের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নাগরিকদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

অনুশীলনী

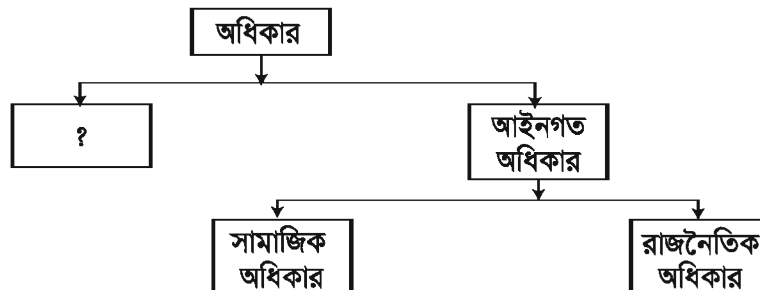
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের বিভিন্ন অধিকার রয়েছে যেমন–
   i. সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার
   ii. সরকারি চাকরি লাভের অধিকার
   iii. মত প্রকাশের অধিকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও ii
গ. i ও iii   ঘ. i ও iii

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে নিচের ছকটি দেখে ২–৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



২. ? চিহ্নিত স্থানে কী হবে?
ক. সাংস্কৃতিক খ. অর্থনৈতিক
গ. ধর্মীয় ঘ. নৈতিক

৩. একজন রোগীর স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার কোন শ্রেণীর অধিকার?
ক. সামাজিক খ. রাজনৈতিক
গ. নৈতিক ঘ. আইনগত

৪. অধিকার বলতে বোঝায়–
i. মানুষের ইচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতা
ii. ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা
iii. স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আলম সৌদি আরবে অবস্থানকালীন সময়ে মালিক কর্তৃক নির্যাতিত হয়। পরে সে বাংলাদেশি দূতাবাসের শরণাপন্ন হয় এবং দেশে ফেরত আসে।

৫. আলম সৌদি আরবে বাংলাদেশি দূতাবাসের শরণাপন্ন হল কেন?
ক. সমালোচনার জন্য খ. নিরাপত্তা লাভ করার জন্য
গ. সাহায্য সহযোগিতার জন্য ঘ. বসবাসের অধিকার লাভের জন্য

৬. আলম সৌদি আরবে গিয়েছিল–
i. জীবন জীবিকার জন্য
ii. সম্পত্তির জন্য
iii. বসবাসের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব সাদিকুল হাসান বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি আইনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি যেখানে চাকুরি করেন সেখানে সবাই তাকে সৎ মানুষ হিসাবে সম্মান করে। কিন্তু গত বৎসর কর বিভাগ সাদিকুল সাহেবকে মোটা অংকের টাকা জরিমানা করে।
ক. নাগরিক কী? খ. রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
গ. সাদেকুল সাহেব কীভাবে জরিমানা থেকে রক্ষা পেতে পারতেন?
ঘ. বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে সাদেকুল সাহেবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকারটি বিশ্লেষণ কর।

অথবা

সাদেকুল সাহেব কী একজন সুনাগরিক? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. জনাব আরিফ সাহেব চাকরি করেন। তিনি সময়মত কর পরিশোধ করেন এবং সততা ও বিবেচনার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। অপরদিকে জনাব আকমল ব্যবসা করেন। তিনি সময়মত কর পরিশোধ করেন না এবং ভোট প্রদানের সময় দলীয় আনুগত্যকেই প্রাধান্য দেন এবং বিবেচনা ছাড়াই তার দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেন।
ক. অধিকার কী?
খ. জনাব আরিফ সাহেব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যে অধিকারটি ভোগ করেন তার বর্ণনা দাও।
গ. জনাব আকমল সাহেব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যে দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন তার ফল কী হতে পারে?
ঘ. আরিফ সাহেবের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনের সাথে অধিকার ভোগের সম্পর্ক রয়েছে– মতামত দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

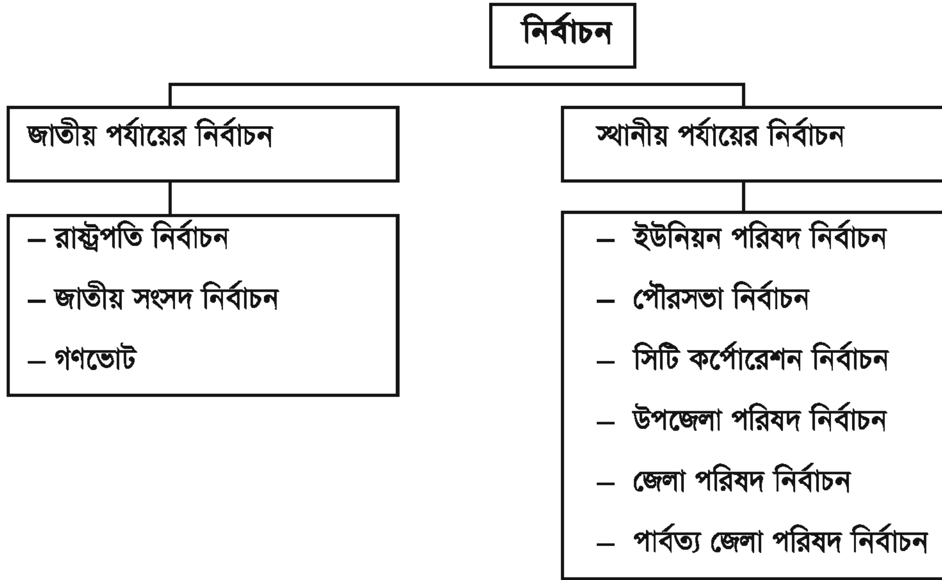
বাংলাদেশের জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন

নির্বাচন সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এটি জনমত প্রকাশের অন্যতম উপায়। এর ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনা করে। তাই নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নির্বাচন জাতীয় এবং স্থানীয়– এ দুইটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। নিচে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন

বাংলাদেশে জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যখন কোন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাগরিকদের মতামত প্রকাশ করে বা প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন তাকে জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন বলে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন, গণভোট ইত্যাদি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের উদাহরণ। অন্যদিকে কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়াই হল স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন। আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ইত্যাদি স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিচের ছকে বাংলাদেশের জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনসমূহ এক নজরে দেখে নিই।

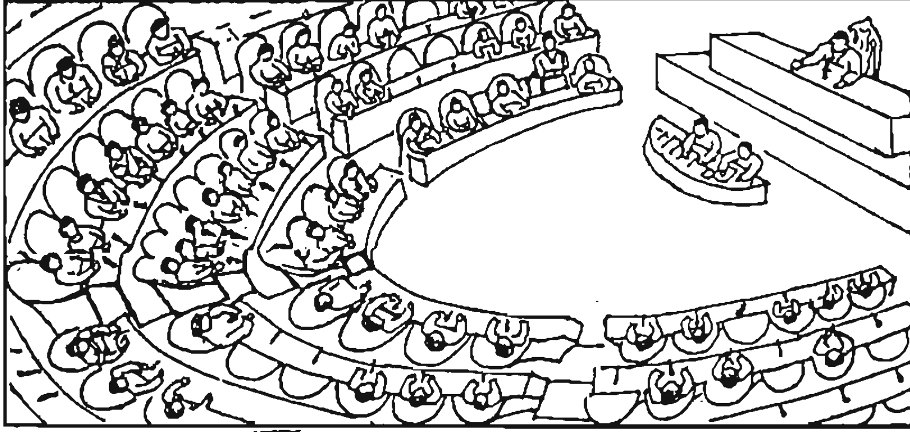
বাংলাদেশের জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন



জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন

(১) **রাষ্ট্রপতি নির্বাচন :** রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন। দেশের সকল জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হন, আর জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(২) **জাতীয় সংসদ নির্বাচন :** বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের সকল ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। এর আসন সংখ্যা ৩৪৫ টি। এর মধ্য থেকে ৪৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সারাদেশের ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে ৩০০টি আসনের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর।



চিত্র ৫.১ : জাতীয় সংসদ অধিবেশন

(৩) **গণভোট :** রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের মতামত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয় না। প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সময়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে।

স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন

(১) **ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন :** দেশের সকল ইউনিয়নে একটি করে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার। ইউনিয়ন পরিষদগুলো মূলত গ্রামভিত্তিক। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে এক জন চেয়ারম্যান, নয় জন সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে তিন জন মহিলা সদস্য রয়েছেন। এদের সকলেই সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(২) **পৌরসভা নির্বাচন :** এই নির্বাচন শহরভিত্তিক। দেশে বর্তমানে ২৫১টি পৌরসভা রয়েছে। প্রতিটি পৌরসভায় এক জন চেয়ারম্যান, কয়েক জন কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনে কয়েক জন মহিলা কমিশনার আছেন। তাঁরা পৌরসভার ভোটারদের সরাসরি ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(৩) **সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন :** বাংলাদেশে বর্তমানে ছয়টি মহানগরী রয়েছে। এগুলো হল ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল। এ ছয়টি মহানগরীতে ছয়টি সিটি কর্পোরেশন আছে। সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের জন্য প্রতিটি মহানগরীকে কয়েকটি সাধারণ ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে এক জন করে কমিশনার এবং সবগুলো ওয়ার্ড মিলিয়ে এক জন মেয়র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তাছাড়া সাধারণ ওয়ার্ড সংখ্যার এক–তৃতীয়াংশ সংখ্যক মহিলা কমিশনারও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

(৪) **উপজেলা পরিষদ নির্বাচন :** বর্তমানে দেশে ৪৮১টি উপজেলা রয়েছে। নতুন প্রণীত ২০০৮ সালের উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলায় একটি উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে। এক জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান

এবং কয়েক জন সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের নিয়ে এই উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে। উপজেলা চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন।

(৫) **জেলা পরিষদ নির্বাচন :** বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে অবশিষ্ট ৬১টি জেলায় একটি করে জেলা পরিষদ রয়েছে। জেলা পরিষদ এক জন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে পাঁচ জন মহিলা সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। জেলা পরিষদের মেয়াদ পাঁচ বছর।

(৬) **পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন :** বাংলাদেশে তিনটি পার্বত্য জেলা আছে। এগুলো হল রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান। প্রতিটি পার্বত্য জেলায় একটি পার্বত্য জেলা পরিষদ রয়েছে যা এক জন চেয়ারম্যান এবং ৩৩ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ পাঁচ বছর।

উপ নির্বাচন

উপরোল্লিখিত সকল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবার উপ নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। যে কোনো নির্বাচনে কোনো আসন থেকে নির্বাচিত কোনো সদস্য মারা গেলে, পদত্যাগ করলে অথবা কোনো কারণে কোনো আসন শূন্য হলে সে আসনে উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ভোটার হওয়ার যোগ্যতা

উপরের আলোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশের জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব নির্বাচনে এক জন নাগরিক ভোটার হওয়ার যোগ্য হবেন যদি তিনি–

- বাংলাদেশের নাগরিক হন
- কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স্ক হন
- সংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকার বাসিন্দা হন এবং
- উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত না হন।

অনুশীলনী

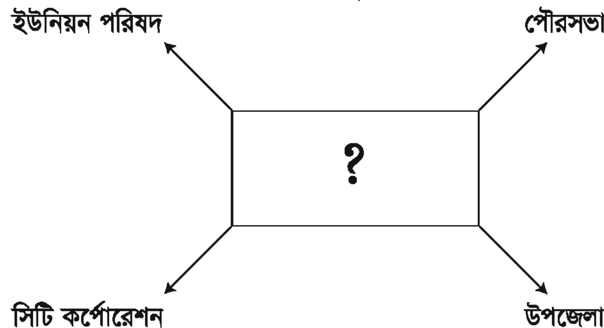
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জাতীয় সংসদ, রাষ্ট্রপতি, পৌরসভা, উপজেলা ইত্যাদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন তথ্যটি অভিন্ন?

ক. নির্বাচন পদ্ধতি খ. আসন সংখ্যা

গ. নির্বাচনের মেয়াদ ঘ. পরিষদের গঠন

নির্বাচন সম্পর্কে নিচের ছকটি দেখ এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



২. "?" চিহ্নিত স্থানে কী হবে?

ক. স্থানীয় নির্বাচন
খ. জাতীয় নির্বাচন
গ. জেলা পরিষদ নির্বাচন
ঘ. উপজেলা নির্বাচন

৩. সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হল–

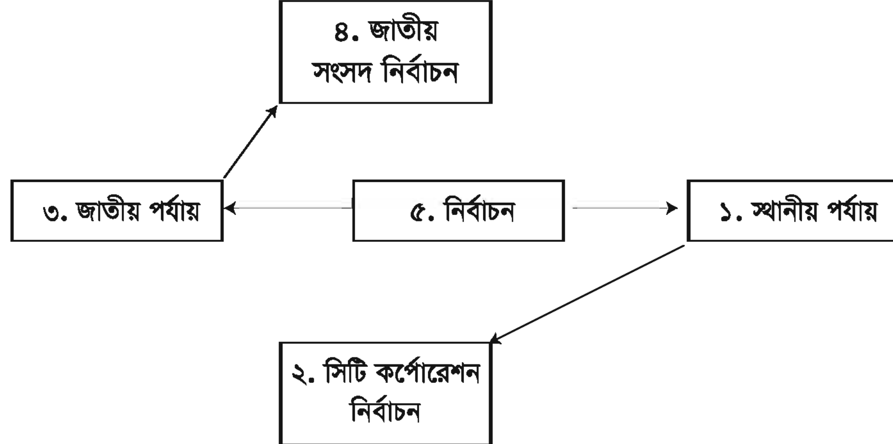
i. প্রতিটি মহানগরীকে কয়েকটি সাধারণ ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়।
ii. সকল ওয়ার্ড মিলিয়ে একজন মেয়র নির্বাচিত হন।
iii. সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্য রয়েছেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



ক. নির্বাচন কী?
খ. ১নং এবং ৩নং বক্সে উল্লেখিত নির্বাচনের পার্থক্য বুঝিয়ে লিখ।
গ. ৫নং বক্সে উল্লিখিত নির্বাচন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মনে কর তুমি সিলেট মহানগরীর একজন নাগরিক। এখানকার স্থানীয় নির্বানের একটি বিবরণ দাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সরকার ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ, সরকারের অঙ্গসমূহ

সরকার

সরকার রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য ও সক্রিয় উপাদান। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে। সরকার ছাড়া রাষ্ট্রের কাজ চলতে পারে না। সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকার নানারকম নিয়মকানুন তৈরি করে। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সরকারের সততা, কর্মদক্ষতা ও দূরদর্শিতার ওপর একটি দেশের অগ্রগতি, জাতীয় সমৃদ্ধি ও মর্যাদা নির্ভর করে।

সরকারের স্বরূপ সবদেশে সবযুগে একরকম থাকে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে মানব সমাজের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। সমাজে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সরকারের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এককালে যুক্তরাজ্যে চরম রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। রাজাই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের ফলে আজ আর সে ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আবরণে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। সেখানে রাজা বা রাণী উত্তরাধিকারসূত্রে দেশের প্রধান, কিন্তু শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। জনগণই সেখানে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা

আধুনিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা দেখা যায়। কোনো কোনো সরকার ব্যবস্থা জনগণের পছন্দ মোতাবেক বিভিন্ন রাষ্ট্রে কার্যকর হতে দেখা যায়, আবার কোনো কোনো সরকার ব্যবস্থা জনগণের ইচ্ছায় গঠিত হয় না। বর্তমান দুনিয়ায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সর্বত্র সমাদৃত হচ্ছে। তবে কোনো কোনো দেশে একনায়কত্ব, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন হতে দেখা যায়। আমরা এখন গণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানব।

গণতন্ত্র: সাধারণভাবে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার বলে। জনগণ ভোটের মাধ্যমে এ ধরনের সরকার গঠন করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। জনগণের আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে সতের থেকে উনিশ শতক ধরে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফ্রান্সে বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি:) মাধ্যমে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইংল্যান্ডে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জনগণের ভোটের মাধ্যমে ৪ বছরের জন্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়। ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন মহাদেশের অনেক দেশেই সরকার গঠনে জনগণের অংশগ্রহণ, ভোটদান ইত্যাদি ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ভারত পৃথিবীর অন্যতম বড়ো গণতান্ত্রিক দেশ। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মাঝে মধ্যে ব্যাহত হয়েছে। তবে বাংলাদেশে আমরা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আবাহাম লিঙ্কন বলেছেন ''গণতন্ত্র হলো জনগণের দ্বারা গঠিত, জনগণের জন্যে বিবেচিত এবং জনগণের জন্যে সরকার।'' জনগণই হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকারের সকল ক্ষমতার মূল উৎস। জনগণ তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলকে ভোট প্রদান করে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সরকার গঠনে অংশগ্রহণ করে থাকে।

সরকার গণতান্ত্রিক আচরণ না করলে জনগণ আন্দোলন করতে পারে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে গঠিত সংসদ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রদান করতে পারে। সরকার পরিবর্তনে জনগণের ইচ্ছা–অনিচ্ছার গুরুত্ব গণতন্ত্রেই প্রতিফলিত হয়। জনগণের অধিকারের স্বীকৃতি, তাদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, পরিসেবাসহ নানাভাবে সহযোগিতা প্রদানে গণতান্ত্রিক সরকারকে কাজ করতে হয়। নতুবা পরবর্তী নির্বাচনে ঐ দলের বিরুদ্ধে জনগণ ভোট প্রদান করতে পারে। তবে যেসব দেশে শিক্ষার অভাব বেশি এবং রাজনৈতিক দলগুলি গণতান্ত্রিক ভাবধারায় পরিচালিত হতে পারেনি সেখানে নির্বাচনে কিছু কিছু সমস্যা হয়ে থাকে। কখনো কখনো অযোগ্য প্রতিনিধি সংসদে নির্বাচিত হতে পারেন। কালো টাকা, ধর্মের অপব্যবহার, উগ্র সাম্প্রদায়িকতাসহ নানা প্রচারণায় সাধারণ ভোটারগণ বিভ্রান্ত হতে পারেন। দুর্বল সরকারও গঠিত হতে পারে। গণতন্ত্রের প্রতিটি একনিষ্ঠ নয় এমন সরকারও ক্ষমতায় আসতে পারে। তবে গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত থাকলে মানুষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করতে শেখে। আধুনিক পৃথিবীতে জনগণের কাছে গণতন্ত্র বেশ সমাদৃত হচ্ছে। তাই দেশে দেশে মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই বেশি গ্রহণ করছে।

একনায়কতন্ত্র: একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এক ব্যক্তির শাসন। প্রাচীন যুগে অনেক দেশে সম্রাট বা রাজা বাদশাহগণ বংশ পরম্পরা বা রাজ্য দখল করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতেন। মধ্য যুগেও রাজবংশের শাসন অব্যাহত ছিল। বেশির ভাগ সম্রাট বা রাজাই সকল ক্ষমতা এককভাবে ভোগ করতেন। জনগণের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। আধুনিক যুগে কোনো কোনো দেশে গণতন্ত্রের নামে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল এবং দলের প্রধান ক্ষমতায় একনায়কতন্ত্র চালু করেন। তারা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন না ঘটিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ বা ব্যক্তিস্বার্থ প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন ইতালীতে মুসোলিনি (১৯২২–১৯৪৫), জার্মানিতে হিটলার (১৯৩৩–১৯৪৫) একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও মুসোলিনি এবং হিটলার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পর উগ্রজাতীয়তাবাদী প্রচারণায় তারা নিজ দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে গণতান্ত্রিক শাসনকে বাদ দিয়ে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইতালী, জার্মানি ও জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এশিয়া ও ইউরোপে মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। একনায়কতন্ত্র কোনো দেশের জনগণের পছন্দের সরকার ব্যবস্থা হতে পারে না। পৃথিবীতে কোনো দেশেই এখন আর মানুষ একনায়ক ব্যবস্থার সরকারকে পছন্দ করে না।

সমাজতন্ত্র: দীর্ঘদিনের শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অনেক মনীষী দেখেছেন। সতের থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপে নানা ধরনের সরকার ব্যবস্থা গড়ার চিন্তা ভাবনা করা হয়, চেষ্টা করা হয়। শোষণহীন সমাজ গঠনের চিন্তা এই সময়ে গড়ে উঠে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ধারণার জন্ম হয়। তখন সম্পদের মালিকানা জনগণের হাতে তুলে দিয়ে তাদের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করে এমন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। রাষ্ট্রের এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে যে সরকার কাজ করে তাকেই সমাজতান্ত্রিক সরকার বলে। ১৯১৭ সালে প্রথমে রাশিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে যে সরকার ক্ষমতায় আসে তারা শোষনহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। পরে মঙ্গোলিয়া, পূর্ব ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ, চীন ও কিউবাসহ কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐসব দেশে যেসব সরকার কাজ করেছিল তাদেরকে সমাজতান্ত্রিক সরকার বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৯০–৯১ সালের দিকে রাশিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সরকারের পতন ঘটে। এসব দেশের জনগণের অভিযোগ ছিল যে সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলো তাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করতে পারেনি তাই জনগণের অসন্তোষ, বিদ্রোহ এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। ঐসব দেশে এখন গণতান্ত্রিক ধাঁচের সরকার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তবে এখনও চীন, উত্তর কোরিয়া ও কিউবায় সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা কায়েম আছে।

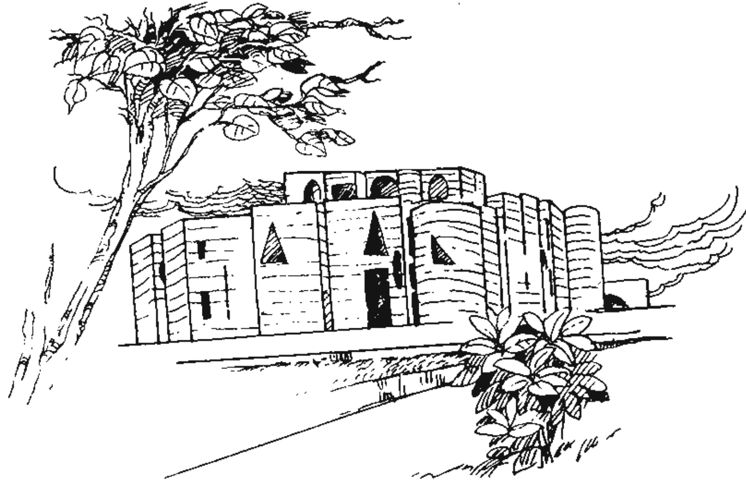
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা অঙ্গ

সরকার রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। সরকারের বিবিধ কাজকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যেমন–(ক) আইন তৈরি করা, (খ) শাসন পরিচালনা করা, (গ) বিচার করা। এসব কাজের দায়িত্বের জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

আইন বিভাগ : আইন বিভাগ এক–কক্ষ বিশিষ্ট বা দুই–কক্ষ বিশিষ্টও হতে পারে। যুক্তরাজ্য, আমেরিকা ও ভারতের আইন পরিষদের দুইটি কক্ষ আছে। বাংলাদেশের আইন পরিষদ এক কক্ষ বিশিষ্ট। বাংলাদেশ আইন পরিষদে ৩৪৫ জন সদস্য রয়েছে। সাধারণ আইন তৈরি করা ও আইনের রদবদল করা আইন পরিষদের কাজ। আইন পরিষদ দেশের জনমত প্রকাশ করে, সরকারের আয়–ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত কাজও করে থাকে। এছাড়া শাসন পরিচালনা ও বিচার সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজও আইন পরিষদ সম্পন্ন করে থাকে। বাংলাদেশের আইন সভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিষদকে জাতীয় সংসদ বলা হয়।

শাসন বিভাগ : রাষ্ট্রের দৈনন্দিন শাসন কাজ এই বিভাগ পরিচালনা করে। রাষ্ট্র প্রধান থেকে শুরু করে গ্রামের চৌকিদার পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে জড়িত সকলেই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

শাসন বিভাগ দেশের ভিতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে, বিদেশের সাথে সম্পর্ক স্থির করে, দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করে এবং এ উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ইত্যাদি প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করে। শাসন বিভাগকে কিছু কিছু আইন বিষয়ক ও বিচার সংক্রান্ত কাজও করতে হয়। চরম শাস্তি মওকুফ করা বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের থাকে। সরকারের আয়–ব্যয়ের হিসাব নিকাশ বা বাজেট সংক্রান্ত কাজও শাসন বিভাগকে করতে হয়। এছাড়া দেশে কৃষির উন্নতি, শিল্প প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা বাণিজ্য ও নানা রকম জনকল্যাণমূলক কাজও শাসন বিভাগ করে থাকে।



চিত্র ৫.২ : জাতীয় সংসদ ভবন

বিচার বিভাগ : দেশের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারপতিদের নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হয়। প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার বিভাগ বিচার করে থাকে। দুষ্টের দমন, অপরাধীর শাস্তি বিধান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে বিচার বিভাগ নাগরিক জীবনকে সুন্দর ও সহজ করে তোলে। বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা করা এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। সংবিধানের ও বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা বিচার বিভাগ দিয়ে থাকে।

অনেক সময় বিচারকগণ নতুন আইনও সৃষ্টি করেন। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্র বহির্ভূত আইনকে বাতিল করে দিতে পারে। বিচার বিভাগ শাসন সংক্রান্ত ও উপদেশমূলক অনেক কাজও করে। এছাড়া নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষা করা ও জাতীয় তদন্তমূলক কাজ পরিচালনা করার দায়িত্বও বিচার বিভাগের। আদালতের নানা প্রকার আদেশপত্র ও নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের আছে।

রাষ্ট্রের সুশাসন অনেকাংশে বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এ জন্য বিচারকদের পক্ষপাতহীন হওয়া দরকার। বিচার বিভাগই শাসনতন্ত্রের ও নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ। বর্তমানে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠন করা হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জনগণের সরকার বলতে কোন ব্যবস্থাকে সমর্থন করে।

ক. একনায়কতন্ত্র খ. গণতন্ত্র
গ. সমাজতন্ত্র ঘ. ধনতন্ত্র

২. একনায়কতন্ত্র ব্যক্তির শাসন। এতে শাসক প্রধান চরম ক্ষমতার অধিকারী। এখানে–

i. এক দেশ এক দল, এক নেতাই দর্শন
ii. সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী বিশেষ বৈশিষ্ট্য
iii. জনগণ শাসকের অনুগত এবং শাসকের আদেশই আইন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের ডায়াগ্রামটি দেখ এবং ৩–৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩. প্রশ্ন (?) চিহ্নিত স্থানে কোন সরকার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত হবে?

ক. সমাজতন্ত্রের খ. প্রজাতন্ত্রের
গ. একনায়কতন্ত্রের ঘ. গণতন্ত্রের

৪. প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত সরকার ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন–

i. হিটলার জার্মানিতে ii. মার্কোস ফিলিপাইনে
iii. মুসোলিনী স্পেনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. কোন কোন দেশের আইন পরিষদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট?

ক. ভারত ও যুক্তরাজ্য
খ. বাংলাদেশ ও ভারত
গ. যুক্তরাজ্য ও শ্রীলঙ্কা
ঘ. নেপাল ও মালদ্বীপ

৬. আইন পরিষদের কাজ হল

i. সাধারণ আইন তৈরি করা
ii. আইনের রদবদল করা
iii. বাজেট সংক্রান্ত কাজ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৭–৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাসেলকে সেনাবাহিনীতে চাকুরিকালীন সময়ে মিথ্যা অভিযোগের জন্য আদালতের রায়ে দণ্ডিত হতে হয়। যেহেতু সে নিরপরাধ তাই তার দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করে তার পরিবার আবেদন করে।

৭. বিচার বিভাগ কাদের নিয়ে গঠিত?

ক. বিচারপতিদের নিয়ে
খ. সেনা সদস্যদের নিয়ে
গ. সংসদ সদস্যদের নিয়ে
ঘ. উকিলদের নিয়ে

৮. শাসন বিভাগের কাজ হল–

i. বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা
ii. চরম শাস্তি মওকুফ বা হ্রাস করা
iii. সরকারের বাজেট সংক্রান্ত কাজ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৯. রাসেলের দণ্ড মওকুফ করার ক্ষমতা কার ওপর ন্যস্ত?

ক. সরকার
খ. রাষ্ট্রপতি
গ. প্রধানমন্ত্রী
ঘ. বিচার বিভাগ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হারুন সাহেব গণতান্ত্রিক শাসনকে সঠিক ব্যবস্থা এবং একনায়কতন্ত্রকে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা মনে করেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু তার ইপ্সিত প্রতিনিধি যোগ্য এবং সৎ থাকা সত্ত্বেও নির্বাচিত না হওয়ায় তিনি হতাশ হলেন। তাছাড়া সরকার গঠিত হওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা আন্দোলন এবং নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি দেখে অনুধাবন করলেন জনগণের মধ্যে শিক্ষা, দেশ প্রেম সততা এবং ত্যাগ না থাকলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল পাওয়া সম্ভব নয়।

ক. গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র কী?
খ. হারুন সাহেব গণতন্ত্রকে জনপ্রিয় সরকার মনে করছেন কেন?
গ. নির্বাচনের ফলাফল কেন হারুন সাহেবকে হতাশ করলো? ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র বিপরীত ধর্মী দুই শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনীতির তিনটি মৌল বিষয় চাহিদা, যোগান ও উৎপাদন

চাহিদা

চাহিদার অর্থ

অর্থনীতিতে চাহিদা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। আকাঙ্ক্ষা থেকে চাহিদার উৎপত্তি। সাধারণ কথায় কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে। কিন্তু নিছক কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অর্থনীতিতে চাহিদা বলা হয় না। অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা, ক্রয় করার ক্ষমতা এবং অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকতে হবে। দ্রব্য ও সেবার উপযোগ আছে বলেই ভোগকারী তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছার প্রকাশ চাহিদা নয়। এর জন্য অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকতে হবে এবং ইচ্ছার সাথে সাথে এর অর্থমূল্য প্রদান করার ক্ষমতাও তার থাকতে হবে। এক জন ভিখারির গাড়ি কেনার শখ আছে। কিন্তু তা ক্রয় করার অর্থ তার নেই। এক জন ধনী কৃপণের রসগোল্লা খাবার শখ আছে। কিন্তু এর জন্য অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা তার নেই। ভিখারি ও কৃপণ ধনীর আকাঙ্ক্ষা কোনটাই চাহিদা নয়। আকাঙ্ক্ষার পেছনে আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছা ও আর্থিক সামর্থ থাকলে ঐ আকাঙ্ক্ষা চাহিদায় পরিণত হয়।

চাহিদা বলতে আবার বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণকে বুঝায়। দাম ছাড়া কোনো চাহিদা হতে পারে না। সুতরাং কোনো দ্রব্যের দাম উল্লেখ না করে চাহিদার কথা বলা যায় না। যেমন, বাজারে আপেলের চাহিদার পরিমাণ বিভিন্ন দামে বিভিন্ন একক হতে পারে। প্রতিটি আপেলের দাম ২.০০ টাকা হলে লোকে ১০টি, ৩.০০ টাকা হলে ৫টি ৫.০০ টাকা হলে ৩টি ক্রয় করতে ইচ্ছুক হবে। সুতরাং দাম না বললে চাহিদার পরিমাণ কী তা জানা যায় না। চাহিদা আবার সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ ছাড়া চাহিদার পরিমাণ বলা অর্থহীন। অর্থাৎ দ্রব্য ও সেবার চাহিদা নির্দেশের বেলায় দাম ও সময়ের উল্লেখ প্রয়োজন।

সুতরাং কোনো দ্রব্যের চাহিদার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকে :

(১) কোনো দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

(২) দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা।

(৩) নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করার ইচ্ছা।

(৪) দ্রব্য বা সেবার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চাহিদা।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে চাহিদার সংজ্ঞা এভাবে নির্ধারণ করা যায়ঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ভোগকারী ক্রয় করতে রাজি থাকে তাকেই অর্থনীতিতে চাহিদা বলে।

চাহিদা বিধি

ভোগকারী বা ক্রেতা যে দামে দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করতে ইচ্ছুক হয় সে দামকে চাহিদা দাম বলে। দাম ও চাহিদার মধ্যে যে সম্পর্ক তা চাহিদা বিধির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কোনো দ্রব্যের চাহিদা দ্রব্যটির দামের ওপর নির্ভর করে। দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে এবং দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। চাহিদার পরিমাণ ও দামের এ সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে। দাম ও চাহিদার পরিমাণ সব সময় একে অন্যের বিপরীত দিকে যায়। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয়। অন্যান্য বিষয়গুলো হল:

(১) ক্রেতার বা ভোগকারীর আর্থিক আয়

(২) ক্রেতা বা ভোগকারীর রুচি, অভ্যাস ও পছন্দ

(৩) নির্দিষ্ট দ্রব্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের দাম

(৪) বাজারে ক্রেতা বা ভোগকারীর সংখ্যা

(৫) ক্রেতা বা ভোগকারীর আচরণ এবং

(৬) সময় মেয়াদ।

উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলোর যে কোন একটির পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধি কার্যকর হবে না। এজন্য চাহিদা বিধির সাথে "অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে" কথাটি যুক্ত থাকে।

চাহিদা সূচি

চাহিদা বিধিকে চাহিদা সূচির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক তা চাহিদা সূচির সাহায্যে দেখানো যায়। বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ সারণি আকারে প্রকাশ করাকে চাহিদা সূচি বলে।

চাহিদা সূচি

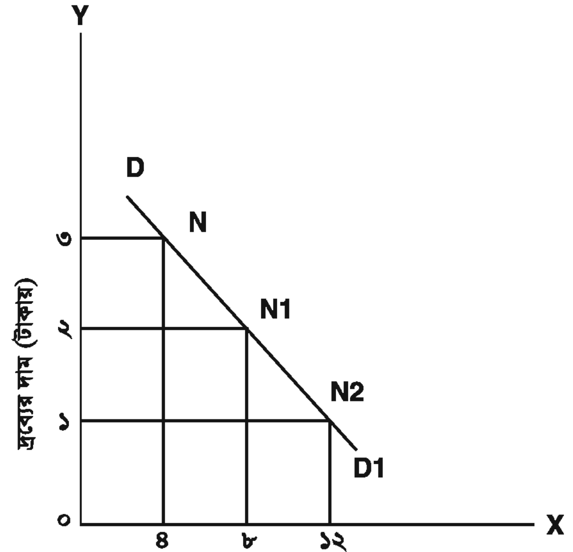
প্রতি একক কমলার দাম	চাহিদার পরিমাণ
৩.০০টাকা	৪টি কমলা
২.০০ টাকা	৮টি কমলা
১.০০ টাকা	১২টি কমলা

তালিকাতে দেখা যাচ্ছে, কমলার দাম যখন ৩.০০ টাকা, তখন চাহিদার পরিমাণ ৪টি। কমলার দাম কমে ২.০০টাকা হলে এর চাহিদার পরিমাণ হয় ৮টি। শেষ পর্যন্ত ১.০০ টাকা দামে কমলার চাহিদার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২টি। এভাবে দাম কমার সাথে সাথে চাহিদার পরিমাণ বাড়তে থাকে। দাম ও চাহিদার সম্পর্ক বিপরীতমুখী।

চাহিদা রেখা

চাহিদা সূচি যখন রেখা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে চাহিদা রেখা বলে। চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দু বিভিন্ন দামে চাহিদার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করে।

চিত্রে OX ভূমিতল অক্ষ চাহিদার পরিমাণ এবং OY লম্ব অক্ষ দ্রব্যের দাম নির্দেশ করে। চিত্রে DD1 রেখাটি একটি চাহিদা রেখা। এ রেখার প্রতিটি বিন্দু দাম ও চাহিদার সম্পর্ক নির্দেশ করে। চাহিদা রেখার উপর অবস্থিত N বিন্দু ৩.০০ টাকা দামে ৪টি কমলার চাহিদা নির্দেশ করে। N_1 বিন্দু নির্দেশ করে যে, দাম কমে যখন ২টাকা হয়, তখন কমলার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৮টি হয়। আবার N_2 বিন্দু নির্দেশ করে যে, দাম কমে যখন ১.০০ টাকা হয় তখন চাহিদার পরিমাণ বেড়ে হয় ১২টি। এভাবেই দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। চাহিদা বিধি কার্যকর হয় বলেই চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী।



চিত্র : ৬.১ : চাহিদা রেখা

যোগান

যোগানের অর্থ

সাধারণত 'যোগান' কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। কখনো যোগান বলতে সব মজুদ দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়। কখনো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হয় তা বোঝানোর জন্য যোগান কথাটি ব্যবহার করা হয়। আবার কখনো কোনো বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের যে পরিমাণ বাজারে বর্তমান থাকে যোগান বলতে তাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে যোগান কথাটি একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রেতাগণ একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে রাজি থাকে অর্থনীতিতে তাকে যোগান বলে। বিক্রেতার নিকট যে পরিমাণ দ্রব্য থাকে তাকে মজুদ বলে এবং বিক্রেতা ঐ মজুদের যে অংশ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে বাজারে বিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে যোগান বলে। বিক্রেতা মজুদের সম্পূর্ণটা বিক্রয় করতে রাজি থাকলে সে মজুদই হবে যোগান। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, এক জন কৃষকের কাছে ১০০ কেজি চাল আছে। চালের দাম প্রতি কেজি ১০.০০ টাকা হলে সে ৭০ কেজি চাল বিক্রয় করতে রাজি আছে। এখানে ১০.০০ টাকা দামে চালের যোগান হবে ৭০ কেজি। সুতরাং যোগান বলতে কোন নির্দিষ্ট দামে যোগানের পরিমাণকে বুঝায়। বিক্রেতা যে দামে দ্রব্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকে যোগান দাম বলে। কোনো দ্রব্যের যোগান আবার নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উৎপাদন, যোগান ও মজুদ : উৎপাদনকারী মূলত বাজারে বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যাদি উৎপাদন করে। তাকে এর জন্য দ্রব্যাদি মজুদ করে বাজারে যোগানের ব্যবস্থা করতে হয়। সুতরাং দেখা যায় উৎপাদন, যোগান ও মজুদ এ ধারণাগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

উৎপাদন বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা তৈরি হয় তাকে বোঝায়। যেমন, এক জন কৃষক বছরে ১০০ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করলে তার উৎপাদনের পরিমাণ হবে ১০০ কুইন্টাল ধান। যোগান মোট উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু যোগান ও মোট উৎপাদন এক নয়। কারণ উৎপাদনের কিছু অংশ উৎপাদনকারী নিজে ভোগ করতে পারে। আবার উৎপাদনের কিছু অংশ বাজারে আসার পূর্বেই নষ্ট হতে পারে। এগুলো যোগানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আবার পূর্বের মজুদ দ্রব্যের কিছু অংশ বাজারে এসে যোগানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সুতরাং মোট উৎপাদন অপেক্ষা যোগান কোনো সময় বেশি আবার কোনো সময় কম হতে পারে।

যোগান ও মজুদের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উৎপাদনকারী বা বিক্রেতার নিকট উৎপাদিত দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য থাকে তাকে মজুদ বলে। বিক্রেতা ঐ মজুদের যে অংশ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে যোগান বলে। বিক্রেতা মজুদের সম্পূর্ণটাই একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকলে ঐ মজুদই হবে যোগান।

যোগান বিধি

দ্রব্যের দামের সাথে যোগানের সম্পর্ক রয়েছে। দাম ও যোগানের মধ্যে এ সম্পর্ক যোগান বিধির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। 'অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে' দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে একেই বলে যোগান বিধি। যেমন, কোন দ্রব্যের দাম ১০.০০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ হয় ১০০ একক, দাম বেড়ে ১৫.০০ টাকা হলে তার যোগানের পরিমাণ হয় ১৫০ একক। দাম কমলে বিক্রেতাগণ কম পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেবে এবং দাম বাড়লে বিক্রেতাগণ বেশি পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেবে। কারণ দাম বাড়লে বিক্রেতাগণ বেশি মুনাফা পাবে এবং দাম কমলে মুনাফার পরিমাণ কম হবে। যোগান বিধি হতে জানা যায়, দামের যে দিকে পরিবর্তন হয় যোগানের পরিমাণ ও সেদিকে পরিবর্তন হয়। 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, যোগান বিধিটি কার্যকর হয়। অন্যান্য অবস্থা হল –

(১) উৎপাদন পদ্ধতি
(২) উপকরণের প্রাপ্তি
(৩) উপকরণের দাম
(৪) পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এসব বিষয় একটিরও পরিবর্তন হলে যোগান বিধি কার্যকর হবে না। এ জন্য যোগান বিধির সাথে "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে" কথাটি যুক্ত থাকে।

যোগান সূচি

যোগান বিধিকে যোগান সূচির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। দাম ও যোগানের পরিমাণের যে সম্পর্ক তাকে যোগান সূচির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন দামে দ্রব্যের কোনো যোগানের পরিমাণ সারণি আকারে প্রকাশ করাকে যোগান সূচি বলে।

যোগান সূচি

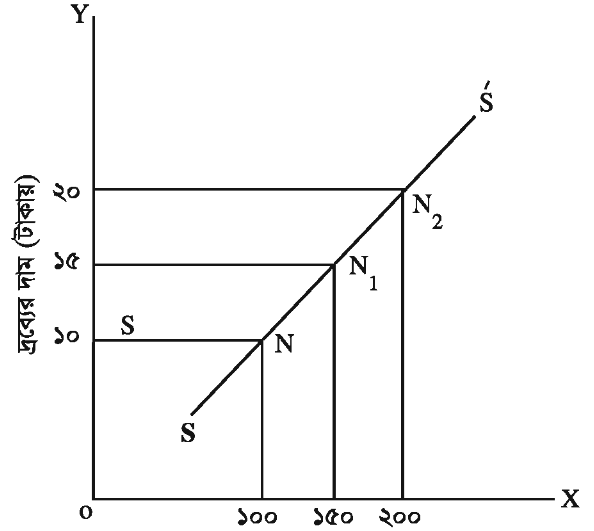
নির্দিষ্ট দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১০.০০ টাকা	১০০
১৫.০০ টাকা	১৫০
২০.০০ টাকা	২০০

তালিকাতে দেখা যাচ্ছে দ্রব্যের দাম যখন ১০.০০ টাকা তখন ঐ দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ ১০০ একক। ঐ দ্রব্যটির দাম বেড়ে ১৫.০০ টাকা হলে তার যোগানের পরিমাণ ১৫০ একক এবং দাম আরও বেড়ে ২০.০০ টাকা হলে ২০০ একক দাঁড়ায়। এভাবে দাম বাড়ার সাথে সাথে যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমার সাথে সাথে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম ও যোগানের সম্পর্ক সমমুখী।

যোগান রেখা

যোগান সূচি যখন রেখা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে 'যোগান রেখা' বলে। যোগান রেখার বিভিন্ন বিন্দু বিভিন্ন দামে যোগানের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করে।

চিত্রে OX ভূমিতল অক্ষ যোগানের পরিমাণ এবং OY লম্ব অক্ষ দাম নির্দেশ করে। SŚ রেখা যোগান রেখা। যোগান রেখা উর্ধ্বগামী হয়। যোগান বিধির কার্যকারিতার জন্য এমন হয়। চিত্রে দেখা যায়, দাম যখন ১০.০০ টাকা, যোগানের পরিমাণ তখন ১০০ একক। দাম বেড়ে যখন ১৫.০০ টাকা হয় তখন যোগান বেড়ে হয় ১৫০ একক। দাম বেড়ে ২০.০০ টাকা হলে যোগান বেড়ে ২০০ একক হয়। SŚ যোগান রেখার উর্ধ্বগামিতাই দাম ও যোগানের সমমুখী সম্পর্ক প্রকাশ করছে।



চিত্র : ৬.২ : যোগান রেখা

উৎপাদন

উৎপাদনের অর্থ

সাধারণ অর্থে উৎপাদন বলতে নতুন কোনো বস্তু বা দ্রব্য তৈরি বা সৃষ্টি করাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে এরূপ অর্থে উৎপাদন কথাটি ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজে কোনো দ্রব্য উৎপাদন, সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। সে শুধু পারে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে নতুন আকৃতি বা রূপ দিয়ে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে। তা দিয়ে সে তার বা অন্যের অভাব মেটায়। যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণপিন্ডকে অলংকারে এবং কাঠমিস্ত্রি বনের কাঠকে আসবাবপত্রে পরিণত করে তা অধিকতর উপযোগী করে তোলে। এখানে অলংকারের উপযোগিতা হতে স্বর্ণপিন্ডের উপযোগিতা এবং আসবাবপত্রের উপযোগিতা হতে বনের কাঠের উপযোগিতা বাদ দিলে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাই স্বর্ণকার এবং কাঠমিস্ত্রির অবদান। এটাকে উৎপাদন বলা হয়। সুতরাং অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদন হল কোনো দ্রব্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টি অথবা উপযোগ বৃদ্ধি। তবে সে উপযোগের অবশ্যই বিনিময় মূল্য থাকতে হবে। উল্লেখ্য, দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার মধ্যে নিহিত মানুষের অভাব মোচনের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে মানুষ আকৃতি পরিবর্তন, এক স্থান হতে অপর কোনো স্থানে স্থানান্তর এবং প্রাচুর্যের সময় আহরণ করে দুষ্প্রাপ্যের সময় যোগানের মাধ্যমে অধিকতর উপযোগ সম্পন্ন করে তুলতে পারে। এসব ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে

সেবামূলক কাজ সম্পাদন করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন, এক জন শিক্ষক শিক্ষাদান করে ছাত্রদেরকে সাহায্য করেন, চিকিৎসক চিকিৎসার দ্বারা রোগীর রোগ নিরাময় করেন। এসব সেবামূলক কাজকেও উৎপাদন বলে গণ্য করা হয়।

উৎপাদনের উপাদান

কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন হয় তাকে উৎপাদনের উপাদান বলে। উৎপাদনের উপাদান মোট ৪টি। এগুলো হল–১. ভূমি ২. শ্রম ৩. মূলধন ৪. সংগঠন।

কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে এ চারটি উপাদানের একত্রীকরণ প্রয়োজন হয়। এর একটি উপাদানকেও বাদ দিলে উৎপাদন সম্ভব হবে না। তাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপাদানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে উৎপাদনের উপাদানগুলোর পরিচয় দেওয়া হল–

১. ভূমি : ভূমি হল উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপাদান। সাধারণ কথায় ভূমি বলতে ভূ–পৃষ্ঠকে বোঝায়, কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমি বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদকে বোঝায়। এ অর্থে পৃথিবীর উপরিভাগ, খনি, বনভূমি, পাহাড়, পর্বত, মৎস সম্পদ, আলো, বায়ু সব কিছুই ভূমির অন্তর্গত। ভূমি ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়।

২. শ্রম : উৎপাদনের দ্বিতীয় উপাদান হল শ্রম। শ্রম বলতে উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমকে বোঝায়। এক জন কৃষক দৈহিক বা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ফসল ফলায়। আবার এক জন বৈজ্ঞানিক তার মানসিক পরিশ্রম দ্বারা আবিষ্কার করেন নানা যন্ত্রপাতি, কলকব্জা। উভয়ের পরিশ্রমই শ্রমের অন্তর্ভুক্ত। ভূমির মত শ্রমও উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান।

৩. মূলধন : মূলধন বলতে সাধারণত টাকা কড়িকে বোঝালেও অর্থনীতিতে টাকা কড়িকে মূলধন বলে না। মানুষের উৎপাদিত যে দ্রব্যগুলো আবার অধিক উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, অর্থনীতির ভাষায় সেগুলো হল মূলধন। যেমন, মানুষ লোহা থেকে যন্ত্র তৈরি করে, এ যন্ত্রটি হল মূলধন। কারণ মানুষ এ যন্ত্রটি তৈরি করেছে এবং যন্ত্রটি অধিক উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হচ্ছে। সুতরাং মূলধন হচ্ছে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। তাই সব ধরনের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত দালানকোঠা সবই মূলধন। উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪. সংগঠন : উৎপাদনের চতুর্থ এবং সর্বশেষ উপাদান হল সংগঠন। ভূমি, শ্রম ও মূলধন বিচ্ছিন্নভাবে কোনো উৎপাদন করতে পারে না। ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্রিত করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে বলে সংগঠন। যে ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদন করেন তাকে বলে 'সংগঠক'। পাইলট ছাড়া যেমন উড়োজাহাজ চলে না তেমনি সংগঠক ছাড়া উৎপাদন চলে না। তাই সংগঠনকে উৎপাদন ব্যবস্থার পাইলট বলা হয়। উপরিউক্ত চারটি উপাদান যথা, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টার ফলেই উৎপাদন সম্ভব হয়। তাই উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

উৎপাদনের বিভিন্ন রূপ : মানুষ যে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন বা অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি বা উপযোগ বৃদ্ধি করে তা পাঁচ প্রকার। যথা – (১) রূপগত উপযোগ, (২) সময়গত উপযোগ, (৩) স্থানগত উপযোগ, (৪) হস্তান্তরগত উপযোগ ও (৫) সেবাগত উপযোগ।

১। রূপগত উপযোগ : কোনো দ্রব্যের আকৃতি, বর্ণ, আয়তন প্রভৃতি পরিবর্তন করে তার উপযোগ বাড়ানো যায়। যেমন, এক টুকরো কাঠের উপযোগ আছে। কাঠের টুকরোটি দিয়ে কোনো মিস্ত্রি যদি চেয়ার তৈরি করে তবে তার উপযোগ

কাঠের টুকরোর উপযোগ অপেক্ষা বেশি হয়। আকৃতি বা রূপ পরিবর্তন করে এ বাড়তি উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। এরূপ উপযোগ সৃষ্টিকে রূপগত উপযোগ বলা হয়।

২। সময়গত উপযোগ : কোনো দ্রব্য এক সময় হতে অন্য সময় পর্যন্ত ধরে রেখে দিলে দ্রব্যের যে উপযোগ বাড়ে তাকে সময়গত উপযোগ বলে। যেমন, বর্ষাকালে পানি অনেক পাওয়া যায় বলে তখন পানির উপযোগ কম থাকে। কিন্তু ঐ পানি শুকনো মৌসুম পর্যন্ত ধরে রেখে দিলে তার উপযোগ বৃদ্ধি পায়। সেটা সময়গত উপযোগ।

৩। স্থানগত উপযোগ : কোনো দ্রব্যকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করে তার উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়; একে স্থানগত উপযোগ বলে। যেমন, কয়লা মাটির নিচে থাকা অবস্থায় তার কোনো উপযোগ নেই। কিন্তু খনি হতে উত্তোলিত হওয়ার পর তার উপযোগ বাড়ে।

৪। হস্তান্তরজনিত উপযোগ : কোনো ব্যক্তির নিকট একটি পণ্যের উপযোগ কম থাকলে তার মালিকানা থেকে যে ব্যক্তির নিকট পণ্যটির উপযোগ অধিক, তার কাছে পণ্যটি হস্তান্তর করলে এর উপযোগ বাড়ে। এভাবেই সৃষ্টি হয় হস্তান্তরগত উপযোগ। যেমন, কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কেউ লোকসানের সম্মুখীন হলে মালিকানা পরিবর্তনের মাধ্যমে উক্ত ব্যবসাকে লাভজনক করে তোলা যায়।

৫। সেবাগত উপযোগ : মানুষ তার শ্রম বা সেবামূলক কাজের দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলা হয়। যেমন, চিকিৎসক চিকিৎসা করে, শিক্ষক শিক্ষাদান করে এবং গায়িকা গান গেয়ে সেবাগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে–
   ক. ক্রেতার আয় খ. দ্রব্যের দাম
   গ. ভোক্তার সংখ্যা ঘ. সময় মেয়াদ

২. মতিন সাহেব একজন দরিদ্র শিক্ষক। বর্তমানে তিনি একটি গাড়ির প্রয়োজন অনুভব করছেন। তার এ প্রয়োজনটি কী?
   ক. অভাব খ. উপযোগ
   গ. চাহিদা ঘ. যোগান

নিচের সূচির আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ
২০	৩০ কেজি
২৫	৪০ কেজি
৩০	৫০ কেজি

৩. চালের দাম বাড়ার ফলে বিক্রেতার যোগান বাড়ার কারণ হচ্ছে–
   ক. দ্রব্যের দাম ও যোগানের সম্পর্ক বিপরীতমুখী খ. দ্রব্যের দাম ও যোগানের সম্পর্ক সমমুখী
   গ. দ্রব্যের দাম ও যোগান পরস্পর সম্পর্কহীন ঘ. দ্রব্যের দাম ও যোগান সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে।

৪. উক্ত যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা অংকন করলে তা হবে–
   ক. বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী   খ. বাম থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী
   গ. ডান থেকে বাম দিকে নিম্নগামী   ঘ. ডান থেকে বাম দিকে উর্ধ্বগামী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচে ১টি পণ্যের দামের সঙ্গে চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক সূচি দেখানো হল।

দাম (প্রতি একক) টাকা	চাহিদার পরিমাণ
১০	২০টি
৮	৪০টি
৫	৬০টি

   ক. চাহিদা কাকে বলে?
   খ. উপরের সূচির আলোকে চাহিদা বিধি ব্যাখ্যা কর।
   গ. উপরের সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা দাও।
   ঘ. কখন এ ধরনের চাহিদা বিধি কার্যকর হবে না? ব্যাখ্যা কর।

২. নিচের চিত্রটি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

Y
D
N
N1
N2
D1
দ্রব্যের দাম (টাকায়)
৩
২
১
০
৪
৮
১২
X
চাহিদার পরিমাণ

   ক. চিত্রে প্রদর্শিত DD^1 রেখাটির নাম কী?
   খ. DD^1 রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
   গ. প্রদত্ত রেখার আলোকে চাহিদার তালিকা তৈরি করে ব্যাখ্যা কর।
   ঘ. এক্ষেত্রে ভোক্তার আয় পরিবর্তনের ফলে চাহিদার ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্তন হবে ব্যাখ্যা কর।

৩. আনিস মিয়া একজন বহুমুখী ব্যবসায়ী। তিনি কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করেন এবং আলু, টমেটো, ইত্যাদি কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করে পরে সুবিধামত সময়ে বিক্রি করেন। এছাড়াও তিনি কক্সবাজারের চিংড়ি ঢাকায় নিয়ে বিক্রি করেন।
   ক. আনিস মিয়ার উপরের কার্যাবলিকে অর্থনীতিতে কী বলে?
   খ. আনিস মিয়া কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করাতে কী ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
   গ. আনিস মিয়া এরূপ অর্থনৈতিক কাজ থেকে কীভাবে লাভবান হচ্ছেন।
   ঘ. আনিস মিয়া কক্সবাজারের চিংড়ি ঢাকায় নিয়ে বিক্রির অর্থনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

আফ্রিকা মহাদেশ

আফ্রিকা মহাদেশ বহুদিন পর্যন্ত সভ্যজগতের নিকট অজ্ঞাত ছিল। বহু ভ্রমণকারীর চেষ্টায় এর অভ্যন্তর ভাগ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়। এজন্য প্রাচীনকালে আফ্রিকা মহাদেশকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' বা অজ্ঞাত মহাদেশ বলা হত। লিভিংস্টোন, স্ট্যানলি, বেকার প্রভৃতি পর্যটকদের দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে এ মহাদেশ বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে।

অবস্থান : ইউরোপের দক্ষিণে এবং এশিয়ার দক্ষিণ–পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশ। এটি ৩৭° উত্তর অক্ষরেখা থেকে প্রায় ৩৫° দক্ষিণ অক্ষরেখা এবং ১৭° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা থেকে ৫১° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর এবং দক্ষিণে ভারত ও আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত। মাদাগাস্কার ব্যতীত এ মহাদেশে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য দ্বীপ নেই।

আয়তন : আয়তনে আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন প্রায় ৩ কোটি ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ১০৭ বর্গ কিলোমিটার (উৎস: বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শীট, ২০০০)।

ভূপ্রকৃতি : উপকূলীয় সংকীর্ণ সমতল ভূমি ছাড়া সমগ্র আফ্রিকা মাহাদেশই একটি বিশাল মালভূমি। এখানে কোনো উচ্চ পর্বত বা নিম্ন সমভূমি নেই। ফলে এ মহাদেশকে একটি **'সুবিস্তৃত মালভূমি'** বলা হয়। এর উত্তর ভাগ অপেক্ষা দক্ষিণ–পূর্ব ভাগ অধিক উঁচু ঢালবিশিষ্ট এ সুবিস্তৃত মালভূমি ধাপে ধাপে নেমে সমুদ্রের নিকট সংকীর্ণ উপকূলীয় সমভূমির সঙ্গে মিশে গেছে।

ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে আফ্রিকাকে নিম্নোক্ত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১। উত্তর–পশ্চিমের আটলাস পার্বত্য অঞ্চল

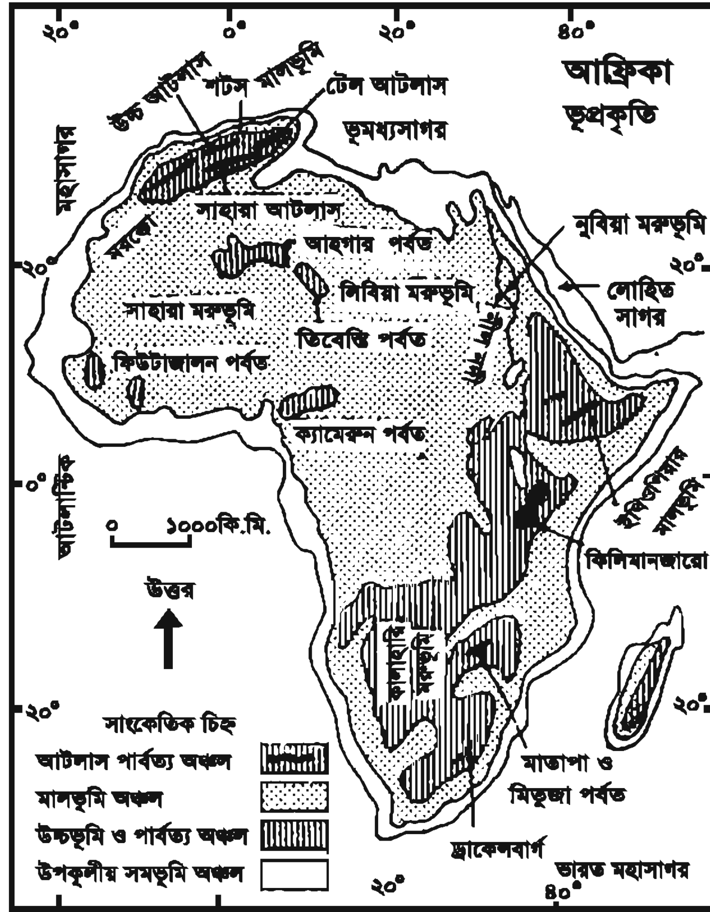
২। আফ্রিকার মালভূমি অঞ্চল

৩। পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার উচ্চভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল

৪। উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল

১। উত্তর–পশ্চিমের আটলাস পার্বত্য অঞ্চল : টেল আটলাস, সাহারা আটলাস ও উচ্চ আটলাস নামক তিনটি প্রায় সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর সমন্বয়ে আটলাস পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এ পর্বতমালার মধ্যবর্তী উপত্যকায় অনেকগুলো লবণাক্ত হ্রদ আছে। আরবিতে এগুলোকে **শটস** (Shotts) বলে। এজন্য এ মালভূমি **'শটস মালভূমি'** নামে পরিচিত।

২। আফ্রিকার মালভূমি অঞ্চল : এ অঞ্চল আটলাস পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণ–পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে পূর্বে নীল নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর গড় উচ্চতা ৩০৫ থেকে ৯১৫ মিটার। **সাহারা, লিবিয়া ও নুবিয়া** মরুভূমি এ অঞ্চলে অবস্থিত। সাহারার মধ্যে **আহগার ও তিবেস্তি** পর্বত অবস্থিত (চিত্র৭.১)।



চিত্র ৭.১: আফ্রিকার ভূপ্রকৃতি

৩। **পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার উচ্চভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল :** লোহিত সাগরের মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণাংশ পর্যন্ত যে সুবিশাল উচ্চভূমি রয়েছে তা এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের উত্তরে ইথিওপিয়ার মালভূমি অবিস্থত। এখানকার অধিকাংশ পর্বতশৃঙ্গ আগ্নেয়গিরির লাভা দ্বারা গঠিত। আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **কিলিমানজারো** (৫,৮৯৫ মিটার) এ অঞ্চলেই অবস্থিত। এ অঞ্চলের দক্ষিণে **জিম্বাবুয়ে, মাতাপা ও মিতুজ্ঞা** পর্বত অবস্থিত। এ উচ্চভূমির সর্বদক্ষিণে **ড্রাকেন্সবার্গ** পর্বত উচ্চপ্রাচীরের ন্যায় সমুদ্র উপকূলে দণ্ডায়মান রয়েছে। বিশাল **কালাহারি মরুভূমি** এ অঞ্চলেই অবস্থিত (চিত্র৭.১)।

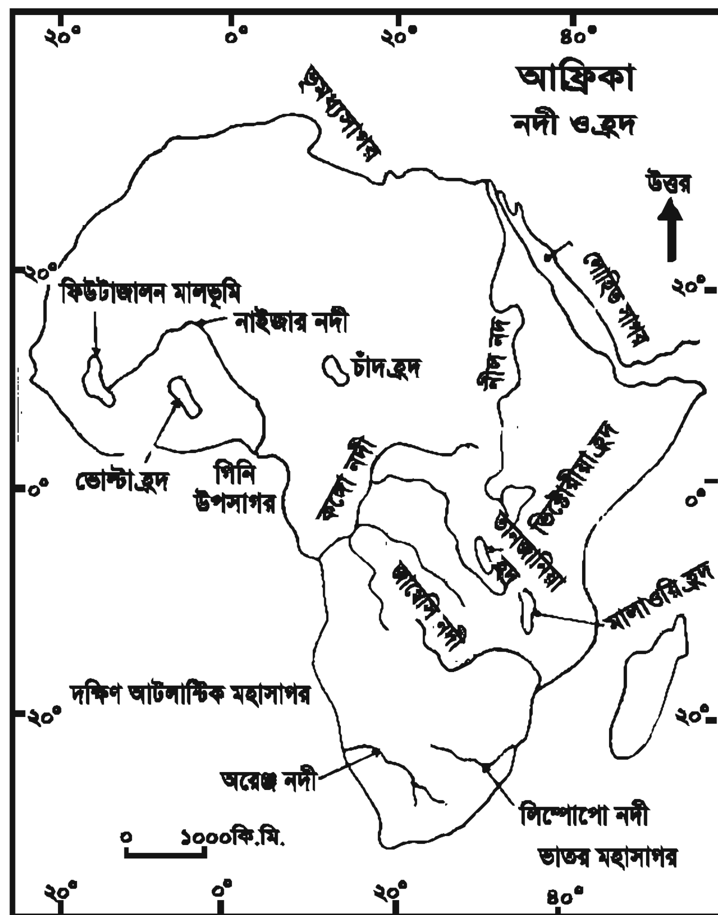
৪। **উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল :** আফ্রিকার নিম্ন সমভূমির পরিমাণ খুবই কম। উত্তরে সিদ্রা উপসাগরের দক্ষিণস্থ নিম্ন সমভূমি, পশ্চিমে সেনেগাল ও জাম্বিয়ার নদীবিধৌত সমভূমি, নাইজার নদীর ক্ষুদ্র ব–দ্বীপ এবং পূর্ব উপকূলের সংকীর্ণ সমভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত (চিত্র৭.১)।

মাদাগাস্কার দ্বীপের মধ্যভাগের উচ্চভূমিও ধাপে ধাপে নিচু হয়ে তার উপকূলীয় সমভূমিতে মিলিত হয়েছে।

নদী

আয়তনের তুলনায় আফ্রিকায় নদীর সংখ্যা বেশ কম। কিন্তু নদীগুলো দীর্ঘ ও বৃহৎ। **নীল, কঙ্গো, নাইজার ও জাম্বেসি** আফ্রিকার প্রধান নদী। **নীল নদ** সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং **কঙ্গো** সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এ মহাদেশের অধিকাংশ নদী দক্ষিণ–পূর্ব দিকের উচ্চ মালভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। উৎপত্তিস্থানের নিকটে প্রাথমিক গতিতে এদের বেগ

অধিক নয় বলে নৌ–চালনা করা যায়। শেষ গতিতে নদীগুলো ধাপে ধাপে সমুদ্রের দিকে নেমে খরস্রোত ও জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে, ফলে নৌচলাচলের যোগ্য নয় (চিত্র৭.২)।



চিত্র ৭.২ : আফ্রিকার নদী ও হ্রদ

১। **নীল** : নীল নদ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬,৬৬৯ কিলোমিটার। এটি **ভিক্টোরিয়া** হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে উগান্ডা, সুদান ও মিসরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। নীল নদের গতিপথে ছোটবড় ৮টি জলপ্রপাত এবং মোহনায় বৃহৎ বদ্বীপ আছে।

২। **কঙ্গো** : কঙ্গো আফ্রিকার দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,৩৭৩ কিলোমিটার। এটি **মালাওয়ি** ও **তানজানিয়া** হ্রদের মধ্যবর্তী উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে জাম্বিয়া ও জায়ারের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়েছে। উৎপত্তিস্থলের কিছু দূরে নিরক্ষরেখার নিকটে কঙ্গো নদীতে স্ট্যানলি ও **লিভিংস্টোন** নামে দুইটি বিখ্যাত জলপ্রপাত আছে।

৩। **নাইজার** : এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,১৮৩ কিলোমিটার। পশ্চিম আফ্রিকার নদী নাইজার **ফিউটাজালন** মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে উত্তর–পূর্ব এবং পরে দক্ষিণ–পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে গিনি উপসাগরে পতিত হয়েছে।

৪। **জাম্বেসি** : এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৭৩৫ কিলোমিটার। আফ্রিকার দক্ষিণ–পূর্বাংশ বিধৌত করে জাম্বেসি নদী ভারত মহাসাগরে পতিত হয়েছে। এ নদীটি জাম্বিয়া–জিম্বাবুয়ে সীমান্তে ১২৮ মিটার নিচে পড়ে বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে।

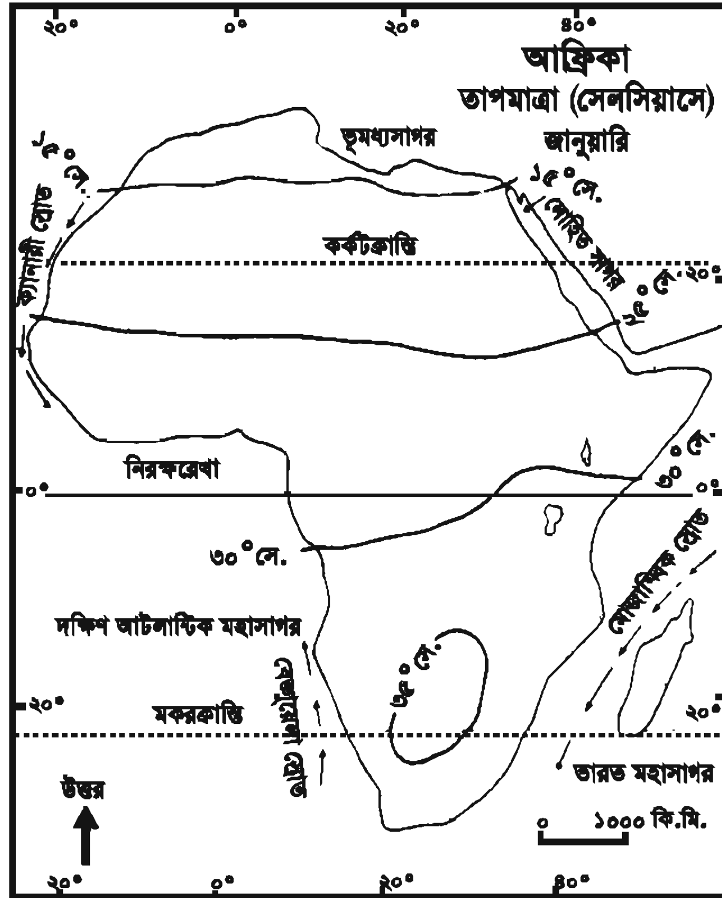
আফ্রিকার অন্যান্য নদীর মধ্যে **অরেঞ্জ, ভোল্টা**, লিম্পোপো, **সেনেগাল** ও **গাম্বিয়া** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হ্রদ

আফ্রিকায় অনেকগুলো প্রসিদ্ধ হ্রদ রয়েছে। এদের প্রায় সবই মহাদেশের পূর্ব ভাগের স্রস্ত উপত্যকা অঞ্চলে অবস্থিত। **ভিক্টোরিয়া** (৬৯,৪৮৫ বর্গ কিলোমিটার) আফ্রিকার বৃহত্তম ও পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম হ্রদ। অন্যান্য হ্রদের মধ্যে **তানজানিয়া, মালাওয়ি, রুডলফ, আলবার্টা, এডওয়ার্ড** এবং **কিয়োগা** অন্যতম। এগুলো স্বাদু পানির হ্রদ। সাহারা মরুভূমির **চাঁদ হ্রদ** এবং কালাহারি মরুভূমির **নাগমী হ্রদের** পানি লবণাক্ত।

জলবায়ু

আফ্রিকার মধ্যভাগ দিয়ে নিরক্ষরেখা, উত্তর ভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা এবং দক্ষিণ ভাগ দিয়ে মকরক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। তাই আফ্রিকার স্থান উষ্ণমন্ডলে এবং উত্তর ও দক্ষিণের সামান্য স্থান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে পড়েছে। এজন্য উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকার ঋতু পর্যায় বিপরীত অর্থাৎ, এর উত্তরে যখন শীতকাল দক্ষিণে তখন গ্রীষ্মকাল। আবার এর উত্তরে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণে তখন শীতকাল থাকে। সেজন্য আফ্রিকায় বছরে দুই বার গ্রীষ্মকাল ও দুই বার শীতকাল হয়। এ মহাদেশের অধিকাংশ স্থান উচ্চ মালভূমি বলে উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত কম। উত্তর ভাগ অপেক্ষা দক্ষিণ ভাগ বেশি উঁচু। সেজন্য দক্ষিণ ভাগে উষ্ণতা অনেক কম।

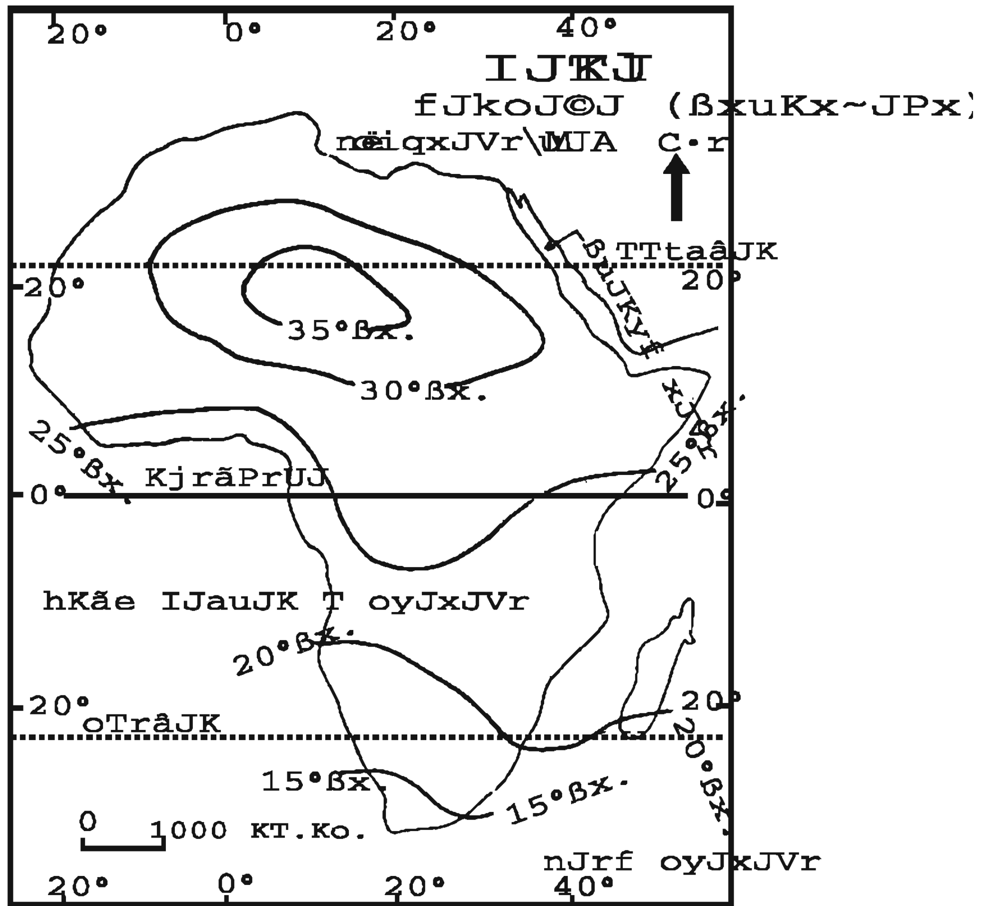


চিত্র ৭.৩ : আফ্রিকার তাপমাত্রা (জানুয়ারি)

নভেম্বর থেকে এপ্রিলের অবস্থা : সূর্যের দক্ষিণায়নের জন্য নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় শীতকাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় গ্রীষ্মকাল। এ সময় আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগে তাপমাত্রা ৩০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস এবং উত্তরে তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে প্রায় ১৫° সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায় (চিত্র ৭.৩)।

এ ঋতুতে সূর্য দক্ষিণে সরে যাওয়ায় বায়ুবলয়গুলোও দক্ষিণে সরে যায় এবং উত্তর–পশ্চিম আফ্রিকায় পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। এ বায়ুর প্রভাবে আফ্রিকার আটলাস পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টি হয়। উত্তর আফ্রিকায় উত্তর–পূর্ব অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। স্থলভাগ থেকে আসে বলে এতে জলীয়বাষ্প থাকে না। সুতরাং শীতকালে এ অঞ্চল বৃষ্টিহীন থাকে। কিন্তু উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। নিরক্ষরেখার দক্ষিণে দক্ষিণ–পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে পূর্ব উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

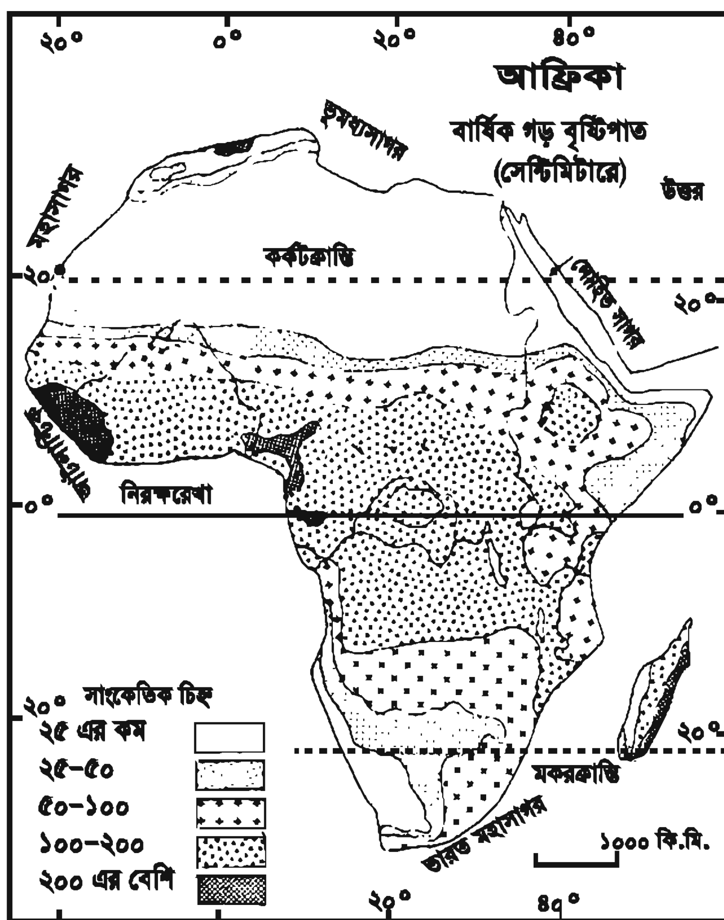
মে থেকে অক্টোবরের অবস্থা : সূর্যের উত্তরায়ণের ফলে মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় শীতকাল হয়। এ সময় উত্তর আফ্রিকায় তাপমাত্রা ৩০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস এবং দক্ষিণে তাপমাত্রা ক্রমশ কমে প্রায় ১৫° সেলসিয়াসে পৌঁছে।



চিত্র ৭.৪ : আফ্রিকার তাপমাত্রা (জুলাই)

প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তর আফ্রিকার বায়ু উষ্ণ ও লঘু হয়ে উপরে উঠে গেলে গিনি উপসাগর ও ভারত মহাসাগর থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়ে গিনি উপকূল ও ইথিওপিয়া অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় (চিত্র ৭.৪)।

গ্রীষ্মকালে উত্তর আফ্রিকায় উত্তর–পূর্ব অয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়, কিন্তু এই বায়ুতে কখনও বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে উত্তর আফ্রিকার বিশাল অঞ্চলে বৃষ্টিহীনতার দরুন উষ্ণ সাহারায় (আরবিতে সাহারা অর্থ মরুভূমি) পরিণত হয়েছে। উত্তর–পশ্চিম পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে আফ্রিকার দক্ষিণ–পশ্চিম প্রান্তের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। এ সময় দক্ষিণ–পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ–পূর্ব উপকূলে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়।



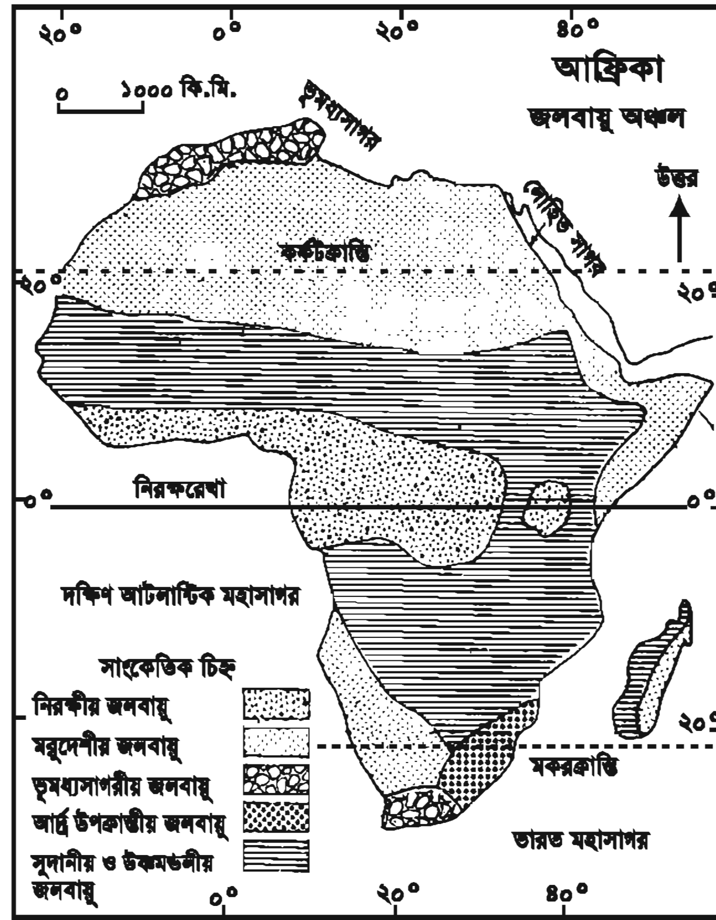
চিত্র ৭.৫ : আফ্রিকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত

কিন্তু নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের উচ্চভূমির দরুন এর পূর্বাংশে বৃষ্টি হয় এবং পশ্চিমাঞ্চল বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল। দক্ষিণ–পশ্চিম উপকূল বৃষ্টিহীন থাকে। এ কারণে সেখানে কালাহারি মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র ৭.৫)।

জলবায়ু অঞ্চল : জলবায়ুর বিভিন্নতার দরুন আফ্রিকা মহাদেশকে নিম্নোক্ত পাঁচটি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় (চিত্র ৭.৬)।

১। **নিরক্ষীয় জলবায়ু :** নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে এরূপ জলবায়ু দেখা যায়। সারা বছর প্রচণ্ড উত্তাপ এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত এ জলবায়ুর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

২। **সুদানীয় ও উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ু :** এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় বলে গ্রীষ্মের প্রখরতা কিছু কম। গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র কিন্তু শীতকাল শুষ্ক।



চিত্র ৭.৬ : আফ্রিকার জলবায়ু অঞ্চল

৩। মরুদেশীয় জলবায়ু : উত্তর আফ্রিকার সাহারা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যামিব ও কালাহারি মরুভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন।

৪। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু : আফ্রিকার উত্তর–পশ্চিম ও দক্ষিণ–পশ্চিম প্রান্ত এ জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে শীতকালে বৃষ্টি হয় কিন্তু গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিহীন থাকে।

৫। আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ু : দক্ষিণ আফ্রিকার মালভূমি অঞ্চলে জলবায়ু উপক্রান্তীয় ও আর্দ্র। এখানে শীতকালে মৃদু শীত এবং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উষ্ণতা অনুভূত হয়।

অধিবাসী ও জনসংখ্যা

আফ্রিকার বিশাল আয়তনের তুলনায় জনবসতি অত্যন্ত কম। মাত্র ৮৬.১০ কোটি। প্রতি বর্গ কিলোমিটার গড়ে মাত্র ২৬ জন লোক বাস করে (উৎস: বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শীট, ২০০৩)। মিসরের নীল নদের উপত্যকায় ও ব–দ্বীপে, উত্তরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, নাইজেরিয়ায় এবং অপেক্ষাকৃত উর্বর অঞ্চলগুলোতে এবং যেখানে মূল্যবান খনিজ পাওয়া যায় সে সকল স্থানে জনবসতি কিছু বেশি। তবে মধ্যভাগের নিরক্ষীয় অরণ্য অঞ্চলে, মরু ও সাভানা অঞ্চলের অনেক স্থানই প্রায় জনমানবহীন। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, যাতায়াত ও জীবিকা অর্জনের সুযোগের অভাব, নানা প্রকার হিংস্রপ্রাণীর উপদ্রব এবং রোগের প্রাদুর্ভাব কম জনবসতির অন্যতম কারণ।

আফ্রিকার অধিবাসীগণ দুই শ্রেণীর –**ককেশীয় ও নিগ্রো।** ককেশীয়গণ সাহারা মরুভূমির উত্তরাংশে, নিগ্রোগণ সাহারার দক্ষিণাংশে বাস করে। নিগ্রোদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে–**বান্টু, বুশম্যান, হটেন্‌টট, পিগমি** এবং **জুলু**। পিগমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খর্বাকার গোষ্ঠী। এদের গড় উচ্চতা প্রায় ১.৩৭ মিটার।

বর্তমানে এ মহাদেশে ইউরোপ ও এশিয়া (চীন, ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান) থেকে বহু লোক এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে।

সম্পদ

মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি থেকে যা সংগ্রহ বা উৎপাদন করা হয় তার নাম সম্পদ। কৃষিজ দ্রব্য, বনজ দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য এবং সমুদ্রজাত দ্রব্য ইত্যাদি সবই সম্পদ। আফ্রিকার বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে কৃষিজ, বনজ, খনিজ, মৎস্য, শিল্প ইত্যাদি সম্পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষিজ সম্পদ

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে উন্নত কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত। এছাড়া নীল নদের অববাহিকায় পানিসেচের মাধ্যমে নানা ধরনের শস্য উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–(ক) খাদ্যশস্য ও (খ) অর্থকরী ফসল (চিত্র ৭.৭)।

(ক) খাদ্যশস্য : আফ্রিকার খাদ্যশস্যের মধ্যে **ধান, ভুট্টা, গম, যব** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধান : আফ্রিকা মহাদেশে পৃথিবীর শতকরা প্রায় ২.৯ ভাগ ধান জন্মে। মিসর, মাদাগাস্কার ও নাইজেরিয়ায় অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হয়।

ভুট্টা : আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকা, মিসর, জিম্বাবুয়ে, অ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে ভুট্টা জন্মে। তবে দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ভুট্টা উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয়।

গম : গম উৎপাদনে এ মহাদেশ তেমন উন্নত নয়। মিসরের নীল নদের অববাহিকা, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বিশিষ্ট মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় গম উৎপন্ন হয়। এ মহাদেশের অধিকাংশ দেশ গম আমদানি করে।

যব : আফ্রিকার মরক্কো, ইথিওপিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশে যবের চাষ হয়।

অন্যান্য : অন্যান্য ফসলের মধ্যে **খেজুর, জলপাই, আঙুর, কমলালেবু, আপেল** ইত্যাদি ফল উল্লেখযোগ্য।

(খ) অর্থকরী ফসল : আফ্রিকার অর্থকরী ফসলের মধ্যে **চা, কফি, কোকো, তুলা, আখ ও রবার** প্রধান।

চা : আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়া, মালাওয়ি, উগান্ডা, মোজাম্বিক, আইভরি কোস্ট, ঘানা, জিম্বাবুয়ে, কঙ্গো, মরিসাস প্রভৃতি দেশে চা উৎপন্ন হয়। এ মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে কেনিয়ায় সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয়।

কফি : পৃথিবীর মোট উৎপাদিত কফির শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ এ মহাদেশেই উৎপন্ন হয়। আইভরি কোস্ট, ইথিওপিয়া, উগান্ডা, ক্যামেরুন, কেনিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর কফি উৎপন্ন হয়।

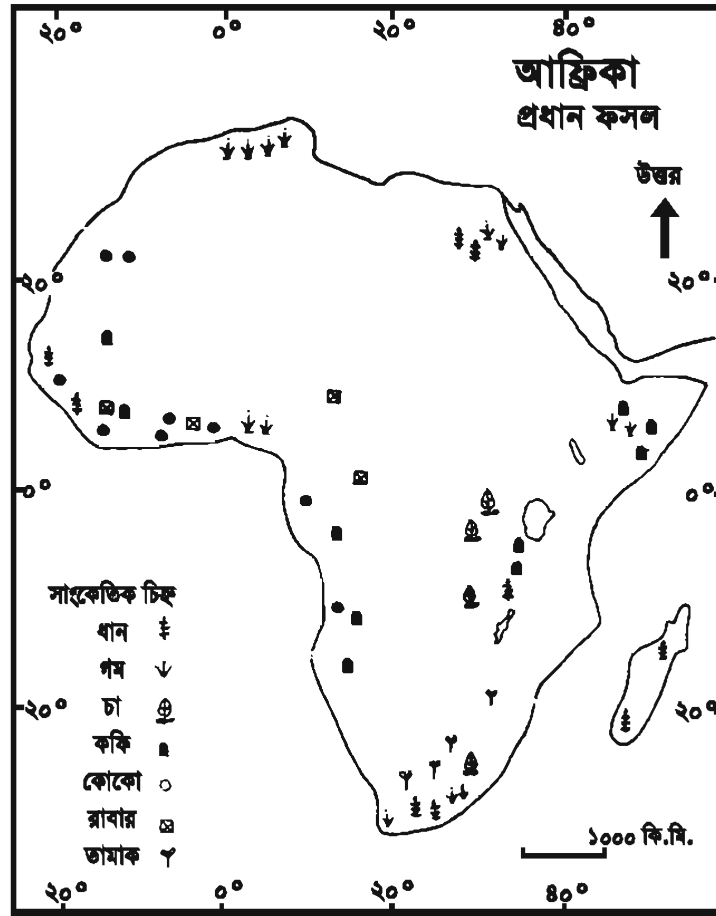
কোকো : আফ্রিকার আইভরি কোস্ট,ঘানা, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন প্রভৃতি দেশ কোকো উৎপাদন ও রপ্তানিতে বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

তুলা : মিসর, সুদান, উগান্ডা, মাদাগাস্কার, জায়ারে, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে তুলা জন্মে। তুলা উৎপাদন ও রপ্তানিতে মিসর প্রসিদ্ধ।

তামাক : আফ্রিকার আলজেরিয়া, জিম্বাবুয়ে, মরক্কো, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকায় তামাক জন্মে। এদের মধ্যে জিম্বাবুয়ের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

আখ : মিসর, মরিসাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, মাদাগাস্কার ও নাইজেরিয়ায় আখ জন্মে।

রবার : জায়ারে নদীর অববাহিকায় পূর্বে প্রচুর বন্য রবার উৎপন্ন হত। বর্তমানে জায়ারে, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া, আইভরি কোস্টে রবার চাষ হয়।



চিত্র ৭.৭ : আফ্রিকার প্রধান ফসল

বনজ সম্পদ

নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে কঙ্গো অববাহিকা এবং গিনি উপকূলে বিশাল বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে মেহগনি, আবলুস, কর্পূর, কোকো, রবার প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। নিরক্ষীয় অরণ্যভূমিকে বেষ্টন করে কেনিয়া, সুদান, তানজানিয়া ও জিম্বাবুয়েতে বিশাল তৃণভূমি বিস্তৃত। স্বল্প বৃক্ষযুক্ত এ তৃণভূমিকে সাভানা বলে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমিতে ভূগর্ভস্থ পানির প্রভাবে কিছু উদ্ভিদ জন্মে। মরূদ্যানে খেজুর গাছ ও বাজরার চাষ হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কর্ক, সিডার ও পাইন বৃক্ষ জন্মে। নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইথিওপিয়ার উচ্চভূমিতে নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি দেখা যায়। এ বনভূমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর পত্রপতনশীল বৃক্ষ জন্মে।

খনিজ সম্পদ

আফ্রিকা মহাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। খনিজ সম্পদ এ মহাদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খনিজ সম্পদের মধ্যে **সোনা, হীরা, কয়লা, খনিজ তেল, তামা, আকরিক লোহা** প্রভৃতি অন্যতম (চিত্র ৭.৮)।

সোনা : দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, জায়ারে ও জিম্বাবুয়ে আফ্রিকার প্রধান সোনা উৎপাদনকারী দেশ। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল ও নাটালের সোনাখনি প্রসিদ্ধ।

চিত্র ৭.৮ : আফ্রিকার খনিজ সম্পদ

হীরা : দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি ও প্রিটোরিয়ার হীরার খনি পৃথিবী বিখ্যাত। বিশ্বের শতকরা প্রায় ৬০ভাগ হীরা এখানে উত্তোলিত হয়। কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, ঘানা, মৌরিতানিয়ায় হীরা পাওয়া যায়।

কয়লা : দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট কয়লা উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। জিম্বাবুয়েতেও কয়লা উত্তোলিত হয়।

খনিজ তেল : লিবিয়া পৃথিবীর অন্যতম খনিজ তেল উত্তোলনকারী দেশ। এছাড়া নাইজেরিয়া, মিসর, আলজেরিয়া ও ঘানায় খনিজ তেল পাওয়া যায়।

টিন : আফ্রিকার জায়ারে, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া ও জিম্বাবুয়েতে টিন পাওয়া যায়। জায়ারে ও দক্ষিণ আফ্রিকা টিনের জন্য প্রসিদ্ধ।

তামা : আফ্রিকার জাম্বিয়া, জায়ারে, জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তামা উত্তোলিত হয়। এদের মধ্যে জাম্বিয়া ও জায়ারের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য।

আকরিক লোহা : আফ্রিকার প্রায় সকল দেশেই কমবেশি আকরিক লোহা পাওয়া যায়। দেশের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও লাইবেরিয়া বিশ্বে প্রসিদ্ধ।

অন্যান্য খনিজ দ্রব্য : এছাড়া আফ্রিকায় **ম্যাংগানিজ, ক্রোমিয়াম, সীসা, দস্তা, কোবাল্ট, প্রাকৃতিক গ্যাস** প্রভৃতি পাওয়া যায়।

মৎস্য সম্পদ

আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কো, নাইজেরিয়া, মিসর, সেনেগাল, গিনি, গ্যাবন, মোজাম্বিক, মাদাগাস্কার ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে মৎস্য ধরা হয়। এসব দেশে অভ্যন্তরীণ নদী থেকেও মৎস্য পাওয়া যায়। পিলচার্ড এ অঞ্চলের প্রধান মৎস্য।

জীবজন্তু

আফ্রিকা মহাদেশের বন-জঙ্গালে বহুবিধ জীবজন্তু বাস করে। এজন্য এ মহাদেশকে একটি 'বৃহদাকার চিড়িয়াখানা' বলা হয়। আফ্রিকায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ দেখা যায়। প্রত্যেক উদ্ভিজ্জ অঞ্চলে তার নিজ নিজ উপযোগী জীবজন্তু বাস করে। যেমন, নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনভূমিতে বৃক্ষচারী বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী ও বেবুন এবং অনিবিড় বনভূমিতে দ্বি-খড়গযুক্ত গন্ডার, হাতি ইত্যাদি বাস করে।

বিস্তীর্ণ সাভানা ও ক্রান্তীয় তৃণভূমিতে জিরাফ, জেব্রা, হাতি, হরিণ, খরগোশ, বন্যমহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। এ অঞ্চলে সিংহ, বাঘ, ভাল্লুকও দেখা যায়। এছাড়া নদী ও হ্রদের পানিতে কুমির ও হিপোপোটেমাস নামক হিংস্র জলহস্তী বাস করে। উটপাখি নামে এক দ্রুতগামী পাখি এখানে বাস করে। পাখা থাকলেও এ পাখি উড়তে পারে না। আফ্রিকার জঙ্গালে অনেক সাপ আছে। এর মধ্যে পাইথন (অজগর) উল্লেখযোগ্য।

শিল্প সম্পদ

বৃহৎ শিল্পে আফ্রিকা তেমন উন্নত নয়। সাম্প্রতিককালে এ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে মূল্যবান খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথে মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানা এবং জার্মিস্টনে সোনা শোধনাগার আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এ মহাদেশের একমাত্র শিল্পোন্নত দেশ। কার্পাস বয়নশিল্প, লোহা ও ইস্পাত শিল্প, সিমেন্ট, সিগারেট প্রভৃতি আফ্রিকার প্রধান শিল্প।

উপজীবিকা : প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশ সত্ত্বেও আফ্রিকার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোক জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি ও পশুপালনের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া খনিজ উত্তোলন, বনজ সম্পদ আহরণ, মৎস্য শিকার ও শিল্প কারখানায় কাজ করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে।

প্রধান শহর ও নগর

কায়রো : নীল নদের ব-দ্বীপে অবস্থিত কায়রো মিসরের রাজধানী। এটি আফ্রিকার বৃহত্তম নগর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর। মুসলমানদের কৃষ্টি ও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে এবং পিরামিডের জন্য কায়রো প্রসিদ্ধ। এখানে বিশ্ববিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

আলেকজান্দ্রিয়া : ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত মিসরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও প্রধান বন্দর।

খার্তুম : ব্লু নীল এবং হোয়াইট নীলের সঙ্গামস্থলে অবস্থিত খার্তুম সুদানের রাজধানী।

কাসাব্ল্যাঙ্কা : মরক্কোয় অবস্থিত কাসাব্ল্যাঙ্কা উত্তর–পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তম শহর ও বন্দর।

ফেজ : মরক্কোর বিখ্যাত নগর ও বন্দর। এটি ফেজ টুপির জন্য বিখ্যাত।

আলজিয়ার্স : আলজেরিয়ার রাজধানী, প্রধান শহর ও বন্দর।

নাইরোবি : সুউচ্চ মালভূমির ওপর অবস্থিত কেনিয়ার রাজধানী ও প্রধান শহর। এটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পর্যটন কেন্দ্র।

জোহানেসবার্গ : দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের বৃহত্তম শহর ও সোনা ব্যবসা কেন্দ্র।

আবিদজান : আইভরি কোস্টের রাজধানী ও প্রধান শিল্প শহর ও বন্দর।

টিম্বাকতু : মালির অন্তর্গত এবং নাইজার নদীর তীরে অবস্থিত। এ শহর একটি প্রাচীন মুসলিম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

আদ্দিস আবাবা : ইথিওপিয়ার রাজধানী। এ শহরে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক পরিষদের (আফ্রিকা শাখা) সদর দপ্তর অবস্থিত।

মাপুতো : মোজাম্বিকের রাজধানী এবং প্রধান বন্দর। এটি একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র।

সলসবেরী : জিম্বাবুয়ের রাজধানী, প্রধান শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

প্রিটোরিয়া : দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশাসনিক রাজধানী।

কেপটাউন : আফ্রিকা মহাদেশের প্রাচীনতম সমুদ্রবন্দর। এখানে কৃত্রিম পোতাশ্রয় রয়েছে।

ইবাদান : নাইজেরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্র।

ডাকার : সেনেগালের রাজধানী এবং পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান সামুদ্রিক বন্দর।

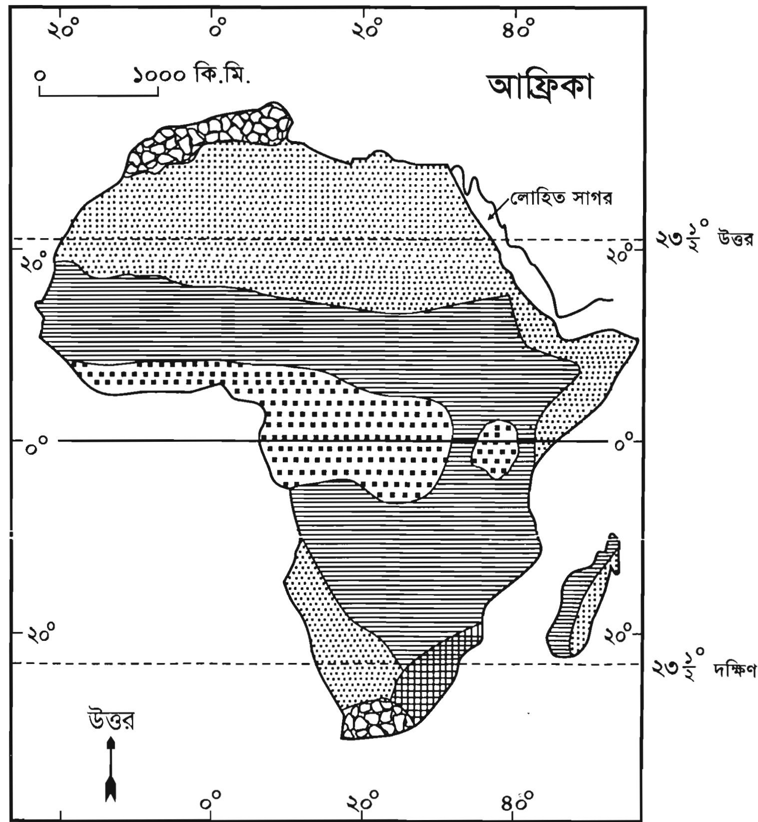
কাম্পালা : ভিক্টোরিয়া হ্রদের নিকট অবস্থিত উগান্ডার রাজধানী। শহরটি কেনিয়া–উগান্ডা রেলপথের ওপর অবস্থিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শর্টস মালভূমি হচ্ছে–
   ক. অনেকগুলো মালভূমির সমষ্টি
   খ. অনেকগুলো হ্রদের সমষ্টি
   গ. অনেকগুলো ক্ষুদ্র ব–দ্বীপের সমষ্টি
   ঘ. অনেকগুলো ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি

মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে ২, ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



২. ২৩ ১/২ রেখাটি মূলত কোন রেখা?
   i. কর্কটক্রান্তি রেখা
   ii. মকরক্রান্তি রেখা
   iii. নিরক্ষরেখা

নিচের কোনটি সঠিক ?
   ক. i
   খ. i ও ii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৩. '?' চিহ্নিত জলবায়ু অঞ্চলটির প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি ?
   ক. সারা বছর প্রচণ্ড উত্তাপ এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত
   খ. উষ্ণ গ্রীষ্মকাল এবং আদ্র শীতকাল
   গ. শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও গ্রীষ্মকাল শুষ্ক
   ঘ. সারা বছর মৃদু উত্তাপ এবং কম বৃষ্টিপাত

৪. আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি কোন জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ?
   ক. নিরক্ষীয় জলবায়ু
   খ. সুদানীয় ও উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ু
   গ. মরুদেশীয় জলবায়ু
   ঘ. ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মুন্না, আরিফ দুই বন্ধু টিভিতে আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা দেখছিল। এক পর্যায়ে মুন্না আরিফকে প্রশ্ন করে আফ্রিকাকে কেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলে। উত্তরে আরিফ বলে প্রচুর গাছপালা ও বনভূমি থাকার কারণে আফ্রিকা মহাদেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হয়। মুন্না আরিফের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলো না।
   ক. আফ্রিকা মহাদেশের অক্ষরেখা লিখ।
   খ. আফ্রিকা মহাদেশকে কেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হয়?
   গ. আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে আটলাস পার্বত্য অঞ্চল চিহ্নিত কর।
   ঘ. কেন আফ্রিকা মহাদেশকে একটি স্ববিস্তৃত মালভূমি বলে? এর স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২. অর্পা National Geographic চ্যানেলে মুগ্ধ হয়ে ভিক্টোরিয়া জল প্রপাত দেখছিল। এতে আফ্রিকার নদনদী সম্পর্কে তার কৌতুহল বেড়ে যায়। সে তার সামাজিক বিজ্ঞান বই পড়ে জানতে পারে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী আফ্রিকায় অবস্থিত। এ মহাদেশের নদীগুলোর প্রাথমিক গতিতে নৌ–চালনা করা যায়। কিন্তু শেষ গতিতে নদীগুলো নৌ চলাচলের যোগ্য নয়।
   ক. পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম কী?
   খ. আফ্রিকার নদীগুলো শেষ গতিতে অনাব্য কেন?
   গ. আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে কঙ্গো নদী চিহ্নিত কর।
   ঘ. আফ্রিকার নদী সম্পর্কে উপরের বক্তব্যের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

৩. টুম্পার এক চাচা লিবিয়ায় এবং আর এক চাচা জিম্বাবুয়ে থাকে। টুম্পার চাচাদের কাছ থেকে জেনেছে লিবিয়ায় যখন গ্রীষ্মকাল তখন জিম্বাবুয়ে শীতকাল বিরাজ করে। টুম্পা অবাক হয়ে ভাবে লিবিয়া এবং জিম্বাবুয়ে একই মহাদেশে অবস্থিত হলেও দুইটি দেশে একই সময়ে দুই ধরনের ঋতু বিদ্যমান।
   ক. আফ্রিকার মধ্যভাগ দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে?
   খ. একই মহাদেশে অবস্থিত হলেও লিবিয়া এবং জিম্বাবুয়ের জলবায়ুর মধ্য ভিন্নতা বিরাজমান কেন?
   গ. আফ্রিকার মানচিত্র অঙ্কন করে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল চিহ্নিত কর।
   ঘ. আফ্রিকার দক্ষিণ–পশ্চিম উপকূলে কালাহারি মরুভূমির সৃষ্টি–এর স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও।

অষ্টম অধ্যায়

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ

অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। এর সমগ্র অংশই নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থিত। মহাদেশটির চারদিকেই সমুদ্রবেষ্টিত।

অবস্থান : এশিয়ার দক্ষিণ–পূর্বে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ অবস্থিত। দক্ষিণের তাসমানিয়া দ্বীপটি এর বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। এ মহাদেশ ১০° দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে ৪০° দক্ষিণ অক্ষরেখা এবং ১১৩° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ১৫৪° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। মকরক্রান্তি রেখা এ মহাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে। অস্ট্রেলিয়ার পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ভারত মহাসাগর অবস্থিত।

আয়তন : অস্ট্রেলিয়ার আয়তন প্রায় ৭৭ লক্ষ ৪১ হাজার ২২০ বর্গ কিলোমিটার (উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শীট, ২০০০)।

ভূপ্রকৃতি : ভূপ্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকে নিম্নোক্ত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

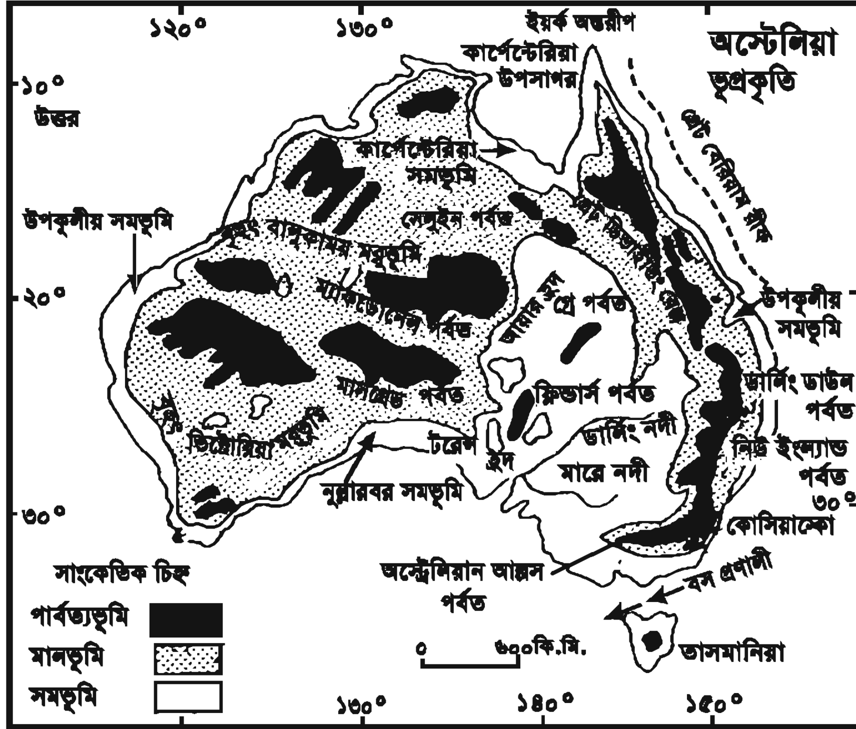
১। পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল
২। পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল
৩। মধ্যভাগের নিম্ন সমভূমি অঞ্চল
৪। উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল

১। পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চল : উত্তরে ইয়র্ক অন্তরীপ থেকে দক্ষিণে বস প্রণালী পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার সমগ্র পূর্ব উপকূলে **গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ** নামে একটি পর্বতমালা অবস্থিত। এটি একটি ভঙ্গিল পর্বত। এ পার্বত্য অঞ্চল বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। উত্তর–দক্ষিণে **ডার্লিং ডাউন্স পর্বত, নিউ ইংল্যান্ড পর্বত, লিভারপুল পর্বত, স্নোঈ পর্বত** এবং সর্বদক্ষিণে **অস্ট্রেলিয়ান আল্পস** পর্বত অবস্থিত। **কোসিয়াস্কো** (২,২৩০ মিটার) অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। গ্রেট ডিভাইডিং পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব দিক খুবই খাড়া এবং পশ্চিম দিক ঢালু। এজন্য পূর্ব দিকের নদীগুলো ক্ষুদ্র ও খরস্রোতা এবং পশ্চিম দিকের নদীগুলো দীর্ঘ ও ক্ষীণস্রোতা। এ অঞ্চলের উত্তর–পূর্ব উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে ১,৯৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রবাল প্রাচীর আছে। এটি **গ্রেট বেরিয়ার রীফ** নামে পরিচিত (চিত্র ৮.১)।

২। পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল : অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে এক সুবিস্তৃত মালভূমি রয়েছে। এর আয়তন সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার অর্ধেকের বেশি এবং উচ্চতা ১৮৩ থেকে ৪৫৭ মিটার। এ মালভূমির অভ্যন্তর ভাগ মরুময় এবং এর স্থানে স্থানে লবণাক্ত হ্রদ ও অনুচ্চ পর্বত রয়েছে।

৩। মধ্যভাগের নিম্ন সমভূমি অঞ্চল : পশ্চিমের মালভূমি ও পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে এ নিম্ন সমভূমি অবস্থিত। **সেলুইন, গ্রে ও ফ্লিণ্ডার্স** পর্বত এ সমভূমিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে। যথা– (ক) **কার্পেন্টেরিয়া সমভূমি,** (খ) **আয়ার হ্রদ অববাহিকা** এবং (গ) **মারে–ডার্লিং** নদীর অববাহিকা।

৪। উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল : অস্ট্রেলিয়ার চারদিকের উপকূল ভাগে অপ্রশস্ত সমভূমি অবস্থিত। কৃষিকাজের উপযোগী বলে এই সমভূমিতে জনবসতির ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। এ অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ শহর ও বন্দর অবস্থিত।



চিত্র ৮.১ অস্ট্রেলিয়ার ভূপ্রকৃতি

নদী

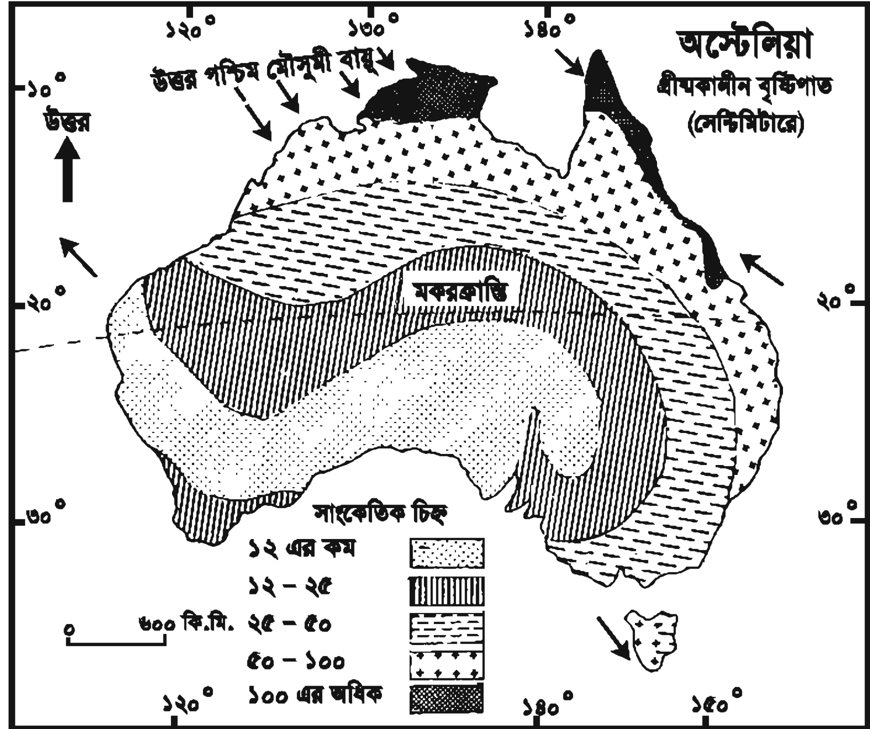
অস্ট্রেলিয়ার নদীগুলো নাতিদীর্ঘ এবং নাব্য নদীর সংখ্যা খুবই কম। **মারে** অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ্য ২,৫৭৪ কিলোমিটার। নদীটি অস্ট্রেলিয়ান আল্পস পর্বতের পশ্চিমের ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে পশ্চিমে, পরে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ভারত মহাসাগরে পড়েছে। **ডার্লিং ও মুরমবিজি** মারে নদীর উপনদী। মারে অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র তুষারগলা নদী এবং কোনো সময়ে শুকিয়ে যায় না।

মহাদেশের অন্যান্য অংশেও অনেক ক্ষুদ্র নদী আছে। তবে সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পূর্ব ঢাল বেয়ে **বার্ডেকিন, ম্যাকেনজি, হান্টার** প্রভৃতি ছোট ছোট নদী পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। **মিশেল, গিলবার্ট, নরম্যান, ফ্লিণ্ডার্স, ম্যাকার্থার** নদী উত্তরে কার্পেন্টেরিয়া উপসাগরে; **ডালি, ভিক্টোরিয়া ও ব্ল্যাক উড** ভারত মহাসাগরে; **কুপার, ক্রীক, ম্যাকামবা, নেল** আয়ার হ্রদে এবং থমসন নদী গ্রেগরী হ্রদে পড়েছে। বৃষ্টির পানিতে সৃষ্ট এই নদীগুলো বর্ষার পর শুকিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ–পশ্চিম উপকূলে কোনো উল্লেখযোগ্য নদী নেই।

জলবায়ু

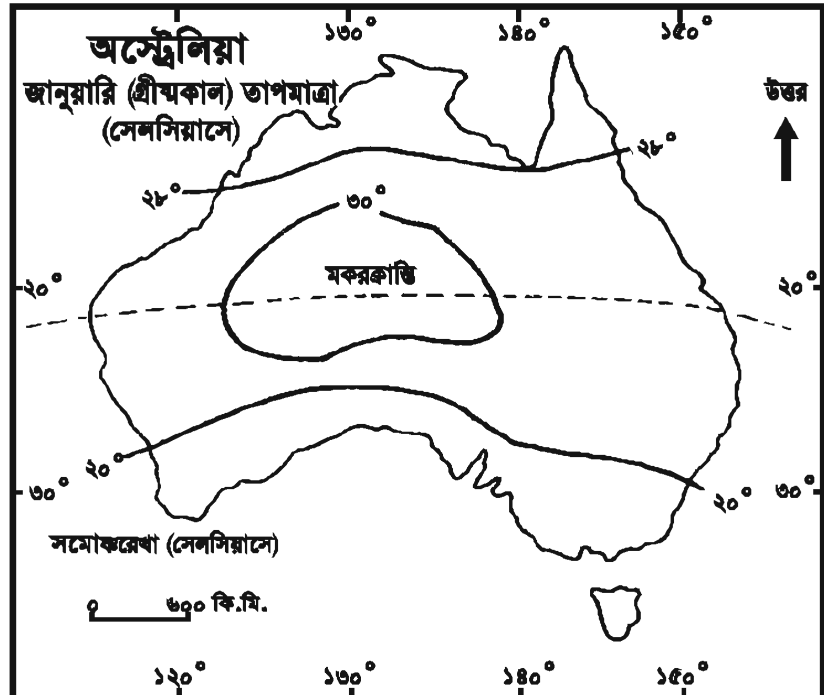
অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। এবং এর প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে মকরক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। সুতরাং এর উত্তরাংশ উষ্ণমণ্ডলে এবং দক্ষিণাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। এর পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তরগামী শীতল স্রোত এবং পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণগামী উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয়। ফলে পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা পূর্ব উপকূল উষ্ণ। উচ্চতার তারতম্যের কারণে জলবায়ুর বিভিন্নতা দেখা যায়। নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ায় উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল অস্ট্রেলিয়ায় তখন গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল অস্ট্রেলিয়ায় তখন শীতকাল। ঋতুভেদে অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু নিম্নে বর্ণনা করা হল।

গ্রীষ্মকাল : সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে সূর্য মধ্য অস্ট্রেলিয়ার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে সেখানে অধিক তাপ অনুভূত হয়। এতে মধ্য অস্ট্রেলিয়ায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখার দক্ষিণে বেঁকে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগে প্রচুর বৃষ্টিপাত (৭৫-১৫০ সেন্টিমিটার) ঘটায়। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এ বৃষ্টিপাত ক্রমশ কমে (১২ সেন্টিমিটার) আসে (চিত্র ৮.২)।



চিত্র : ৮.২ অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত

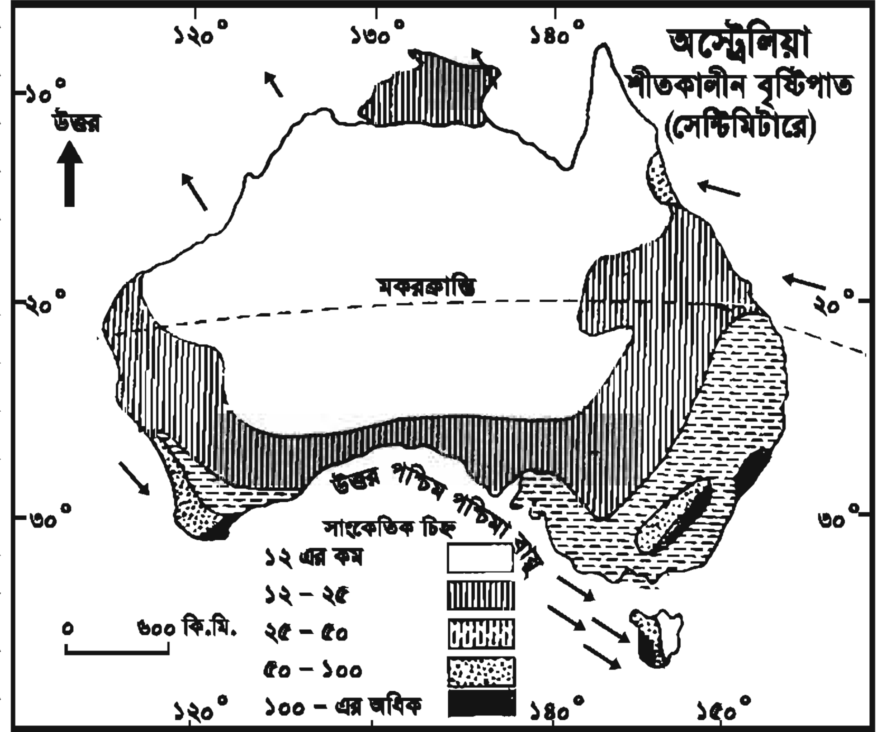
জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার উষ্ণতম মাস। এ সময়ে অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে ১৮° সেলসিয়াস, মধ্যভাগে ৩০° থেকে ৩৫° সেলিয়াস এবং দক্ষিণে প্রায় ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা অনুভূত হয় (চিত্র ৮.৩)।



চিত্র ৮.৩ : অস্ট্রেলিয়ার তাপমাত্রা

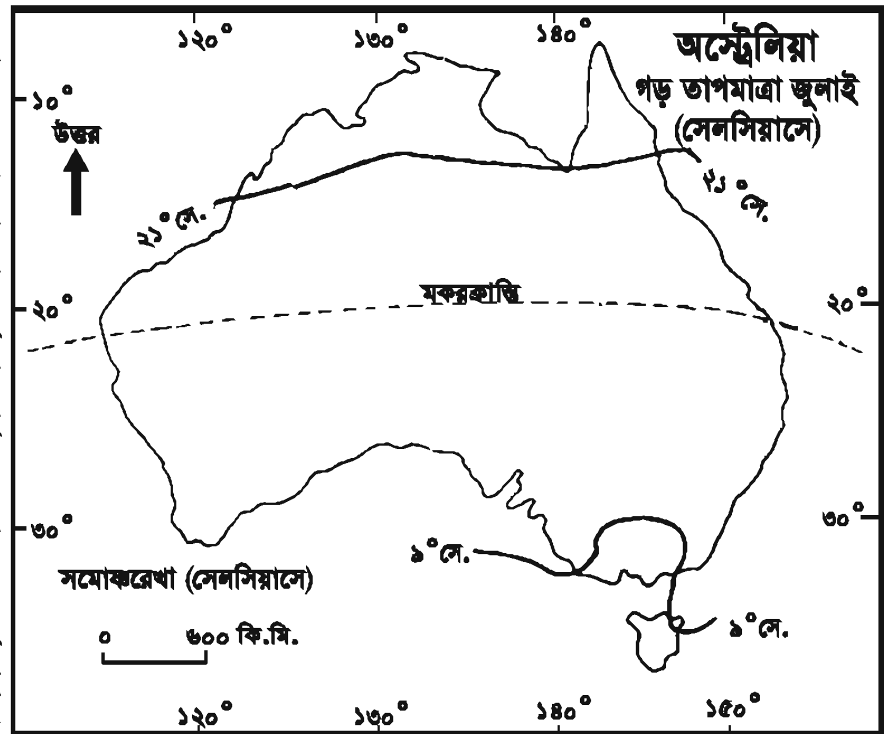
শীতকাল : মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় শীতকাল। এ সময় সূর্য উত্তর গোলার্ধে থাকায় বায়ুবলয়গুলো উত্তরে সরে যায়। এতে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাংশের ওপর দিয়ে উত্তর–পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। এ বায়ুর প্রভাবে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত হয়। এ অঞ্চল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্তর্গত (চিত্র ৮.৪)।

প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আগত দক্ষিণ–পূর্ব অয়ন বায়ু পূর্ব উপকূলের পর্বতগাত্রে বাধা পেয়ে এখানে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত (১২৫–২৫০ সেন্টিমিটার) ঘটায়। কিন্তু এ পর্বতের পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়।



চিত্র ৮.৪ : অস্ট্রেলিয়ার শীতকালীন বৃষ্টিপাত

জুলাই অস্ট্রেলিয়ার শীতলতম মাস। এ সময় উত্তরাংশে তাপমাত্রা ২১° সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যায় এবং দক্ষিণাংশে আরও নিচে নেমে প্রায় ৯° সেলসিয়াসে পৌঁছে (চিত্র ৮.৫)।



চিত্র ৮.৫ : অস্ট্রেলিয়ার গড় তাপমাত্রা

অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগে গ্রীষ্মকালে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পশ্চিমাংশে শীতকালে এবং পূর্ব উপকূলে প্রায় সারা বছরই বৃষ্টি হয়। মধ্য ও পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত খুব হয়। ফলে এ অঞ্চল শুষ্ক ও মরুময়।

অধিবাসী ও জনসংখ্যা

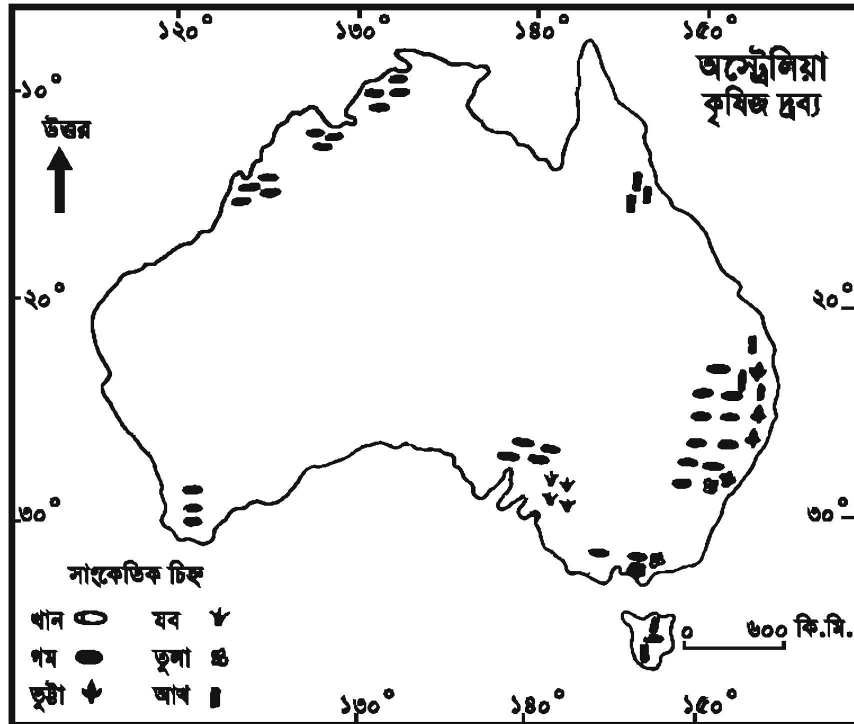
এ মহাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১.৯৯ কোটি এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব মাত্র ৩ জন (উৎস: বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শীট, ২০০৩)। এত কম জনবসতি পৃথিবীর অন্য কোন মহাদেশে বা দেশে দেখা যায় না। আবার এর জনবসতির ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। অর্থনৈতিক সম্পদ ও বৃষ্টিপাত এ মহাদেশের জনসংখ্যা বণ্টনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে মহাদেশের পূর্ব, দক্ষিণ–পূর্ব এবং দক্ষিণ–পশ্চিম কোণের উপকূলবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। এসব অঞ্চল কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। অপরদিকে মরুময় শুষ্ক জলবায়ু এবং অনুর্বর মৃত্তিকার জন্য মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর অস্ট্রেলিয়া প্রায় জনহীন। অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ লোক (শতকরা প্রায় ৮০ জন) শহরে বাস করে। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউরোপীয়গণ এখানে এসে শহরেই বসতি স্থাপন করেছিল।

সম্পদ

মানুষের অভাব মিটানো বা চাহিদা পূরণের জন্য প্রকৃতি থেকে যা সংগ্রহ বা উৎপাদন করা হয় তার নামই সম্পদ। কৃষিজ দ্রব্য, বনজ দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য, সমুদ্রজাত দ্রব্য ইত্যাদি সবই সম্পদ। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সম্পদ নিম্নে আলোচনা করা হল।

কৃষিজ সম্পদ

অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও অনুর্বর মৃত্তিকার জন্য এ মহাদেশের মাত্র শতকরা ২ ভাগ জমিতে কৃষিকাজ করা হয়। বৃষ্টিযুক্ত উর্বর নদী উপত্যকায় অধিকাংশ কৃষিকাজ হয়ে থাকে। এ কারণে দেশের উত্তর–পূর্ব, দক্ষিণ–পূর্ব ও দক্ষিণ–পশ্চিমাংশে কৃষিকাজ সীমাবদ্ধ। গম, আখ, তুলা, ভুট্টা, যব, ধান ইত্যাদি অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। কৃষি জমির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জমিতে গমের চাষ হয়। অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর আখ জন্মে। পানি সেচের মাধ্যমে মারে ও ডার্লিং নদীর উপত্যকায় ধানের চাষ হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে অস্ট্রেলিয়া গম, চাল ও চিনি রপ্তানি করে থাকে (চিত্র ৮.৬)।



চিত্র ৮.৬ : অস্ট্রেলিয়ার কৃষিজ সম্পদ

ফল : অস্ট্রেলিয়ায় নানা প্রকার ফল জন্মে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কমলালেবু ও পীচ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ডুমুর, আপেল, কমলালেবু ও আঙুর এবং গ্রীষ্মমণ্ডলে আম, আনারস ইত্যাদি জন্মে। এদেশ থেকে প্রচুর শুষ্ক ও কাঁচা ফল বিদেশে রপ্তানি হয়।

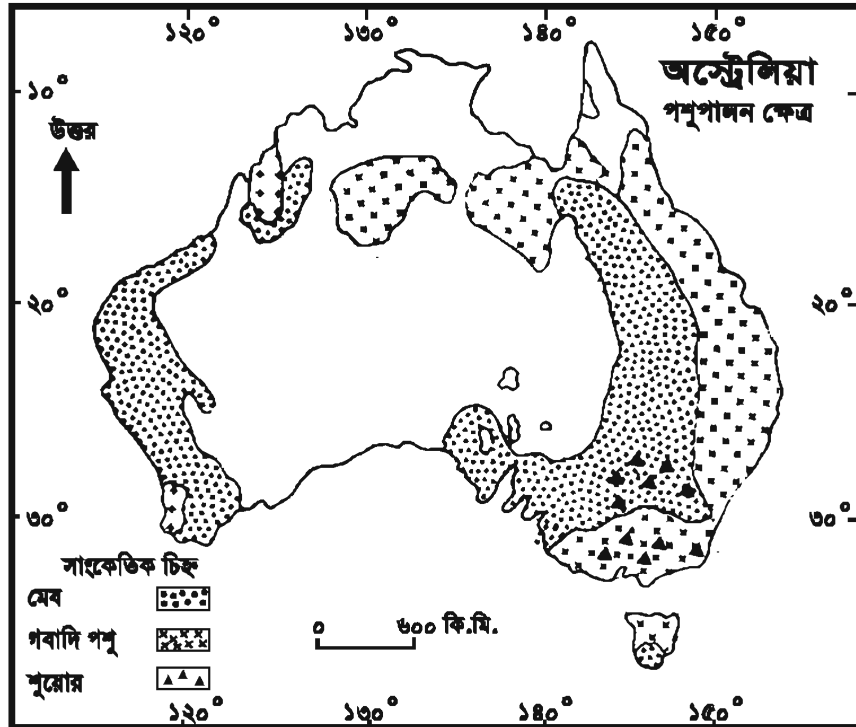
বনজ সম্পদ

অস্ট্রেলিয়ায় কোনো বৃহৎ নিবিড় অরণ্য নেই। উত্তরের মৌসুমী অঞ্চলে, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য বনভূমি রয়েছে। বৃষ্টিহীনতার জন্য মধ্য ও পশ্চিমাংশে তৃণভূমি দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার বৃক্ষাদির মধ্যে **ইউক্যালিপটাস** উল্লেখযোগ্য। এছাড়া **জারা, কারি, সিডার, পাইন** প্রভৃতি বৃক্ষও এখানে জন্মে।

পশু সম্পদ

অস্ট্রেলিয়া পশুপালনে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাদেশ। এর অর্থনীতি পশুপালনের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অল্প বৃষ্টিপাতের কারণে মধ্য অস্ট্রেলিয়ায় সৃষ্ট তৃণভূমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেষ চারণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ মেষ উৎকৃষ্ট পশম প্রদানকারী **'মেরিনো'** জাতীয়। পশম উৎপাদন ও রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়। অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ছাগল, ঘোড়া ও শূকর অন্যতম (চিত্র ৮.৭)।

স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় অস্ট্রেলিয়া থেকে গুরুর চামড়া, ঘনীভূত দুগ্ধ, মাখন, পনির ও মাংস প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়।



চিত্র ৮.৭ : অস্ট্রেলিয়ার পশুপালন ক্ষেত্র

জীবজন্তু

অস্ট্রেলিয়ায় অনেক বিচিত্র জীবজন্তু আছে। ক্যাঙ্গারু, অপোসাম প্রভৃতি প্রাণী অপূর্ণাঙ্গভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং মায়ের পেটের নিচে একটি থলিতে বাহিত হয়। বন্যকুকুর জাতীয় একমাত্র হিংস্রপ্রাণী ডিঙ্গো এবং হাঁসের মত পা ও ঠোঁটযুক্ত প্লাটিপাস নামে একপ্রকার ছুঁচো এবং শ্বেতকাক ও কালো রাজহাঁস প্রভৃতি অদ্ভুত প্রাণী এখানে দেখতে পাওয়া যায়। সাগর গাভী নামে পরিচিত ডুগং স্তন্যপায়ী এবং তৃণভোজী কিন্তু পানিতে বাস করে।

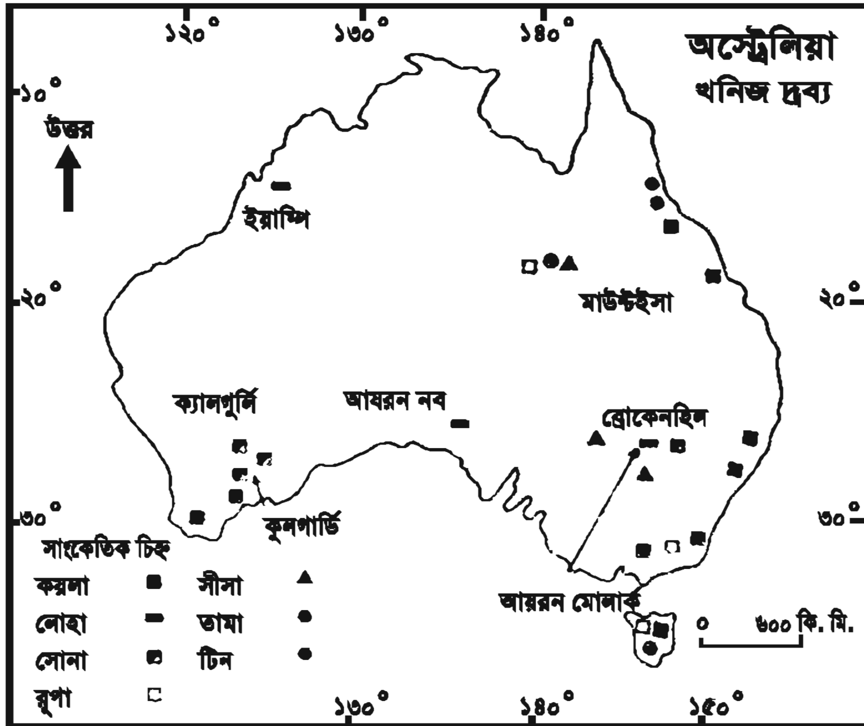
অস্ট্রেলিয়ায় নানান রকমের সুন্দর পাখি আছে। উটপাখির মত এমু উড়তে পারে না, কিন্তু দৌড়াতে পারে। এছাড়া লায়ার, টিয়াপাখি, কাকাতুয়া প্রভৃতি অস্ট্রেলিয়ার উল্লেখযোগ্য পাখি।

সামুদ্রিক সম্পদ

অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে মাছ ধরার সুযোগ কম হলেও দূর প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে তিমি, হাঙর প্রভৃতি ধরা হয়। উত্তর–পূর্ব উপকূলের সমুদ্র থেকে প্রচুর মুক্তা সংগ্রহ করা হয়।

খনিজ সম্পদ

অস্ট্রেলিয়া খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এর প্রত্যেক প্রদেশে কয়লা পাওয়া যায়। নিউ সাউথ ওয়েলস এবং কুইন্সল্যান্ডে প্রধান কয়লার খনিগুলো অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর লোহা উত্তোলিত হয়, যা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সোনা উৎপাদনেও অস্ট্রেলিয়া প্রসিদ্ধ। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ক্যালগুর্লি ও কুলগার্ডি খনি থেকে মহাদেশের অর্ধেকেরও বেশি সোনা উত্তোলিত হয় এছাড়া তামা, রুপা, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যও এ মহাদেশে প্রচুর পাওয়া যায় (চিত্র ৮.৮)।



চিত্র ৮.৮ : অস্ট্রেলিয়ার খনিজ সম্পদ

শিল্প সম্পদ

অস্ট্রেলিয়া একটি শিল্পোন্নত মহাদেশ। লোহা ও ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ, কার্পাস বয়ন ও পশম অস্ট্রেলিয়ার প্রধান শিল্প। এছাড়া মেলবোর্ন, সিডনি ও ফ্রিম্যান্টেলে তেল শোধনাগার আছে।

প্রধান শহর ও বন্দর

সিডনি : নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশের রাজধানী, প্রধান বন্দর, শিল্প কেন্দ্র এবং অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম নগর।

মেলবোর্ন : ভিক্টোরিয়া প্রদেশের রাজধানী। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, বন্দর এবং বিখ্যাত শিল্প কেন্দ্র।

এডিলেড : দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের রাজধানী। পশম, গম, চামড়া, মাংস, ফল ইত্যাদি রপ্তানি কেন্দ্র।

ক্যানবেরা : অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী, বিখ্যাত বন্দর ও শিল্প কেন্দ্র।

এছাড়া খনির শহর **ব্রোকেনহিল**, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের রাজধানী **পার্থ**, উত্তর অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের **রাজধানী ডারউইন**, পশ্চিম উপকূলের **ফ্রিম্যান্টেল** বন্দর, তাসমানিয়া প্রদেশের রাজধানী **হোবার্ট** প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দর এ মহাদেশে রয়েছে।

অনুশীলনী

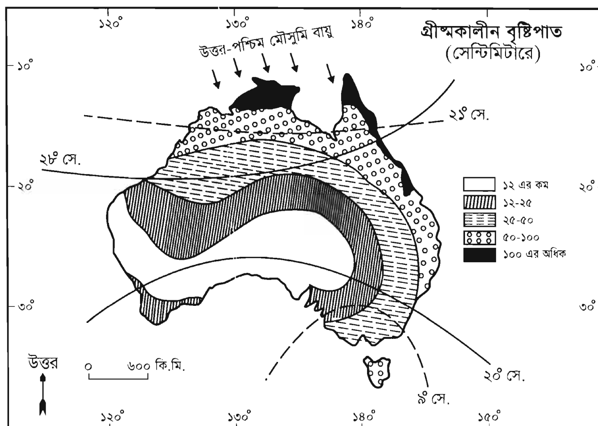
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতম নদী মারে সম্পর্কে নিম্নের কোন উক্তিটি সঠিক?

i. মারে অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র তুষারগলা নদী
ii. ডালিং ও মুরমবিজি এ নদীর উপনদী
iii. মারে নদীটি শীতকালে শুষ্ক থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii



ওপরের মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে ২, ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

২. মানচিত্রটিতে অস্ট্রেলিয়ার কী দেখানো হয়েছে?

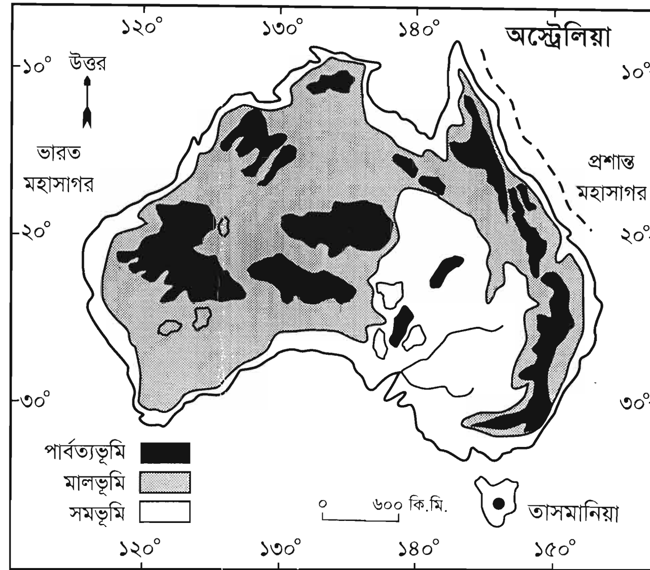
ক. তাপমাত্রা খ. বৃষ্টিপাত
গ. বায়ুপ্রবাহ ঘ. জলবায়ু

৩. ১০০ সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত কোন বায়ুর প্রবাহে হয়?
ক. উত্তর–পুর্ব আয়ন বায়ু
খ. উত্তর–পশ্চিম মৌসুমী বায়ু
গ. দক্ষিণ–পূর্ব অয়ন বায়ু
ঘ. উত্তর–পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু

৪. অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাংশে জুলাই মাসের তাপমাত্রা কত?
ক. ২৮° সে.
খ. ২১° সে.
গ. ২০° সে.
ঘ. ৯° সে.

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



ক. চিত্রে প্রদর্শিত মহাদেশটির নাম উল্লেখ কর।
খ. চিত্রে প্রদর্শিত মহাদেশের অবস্থান বর্ণনা কর।
গ. প্রতিরূপ একটি মানচিত্র অঙ্কন করে উপকুলীয় সমভূমি অঞ্চল চিহ্নিত কর।
ঘ. ‘গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ একটি ভঙ্গিল পর্বত’ এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

২. কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে শিহাবের সঙ্গো একজন অস্ট্রেলিয়ান পর্যটকের পরিচয় হয় প্রসঙ্গাক্রমে অস্ট্রেলিয়ান পর্যটক শিহাবকে জানায় তার দেশে একই দিনে কখনও কখনও শীত ও গ্রীষ্মের আবহাওয়া অনুভব করা যায়। তিনি বলেন সকালে প্রচণ্ড উত্তাপ থাকলে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পর তাপমাত্রা নেমে যায় এবং কনকনে শীত অনুভূত হয়। শিহাবের অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু সম্পর্কে কৌতুহল বেড়ে যায়।
ক. অস্ট্রেলিয়ার শীতলতম মাসের নাম লিখ।
খ. অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
গ. সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের একটি চার্ট তৈরি কর।
ঘ. ‘অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু বাংলাদেশের জলবায়ুর বিপরীত’–এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশ

সম্পদ

মানুষের জীবন ধারণের সবরকম প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রকৃতি থেকে যা সংগ্রহ, উত্তোলন ও উৎপাদন করা হয় একে সম্পদ বলে। সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান উপাদান। বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে মৎস্য, বনজ, খনিজ ও কৃষিজ সম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এসব সম্পদের বিবরণ দেওয়া হল।

মৎস্য সম্পদ

মাছ বাংলাদেশের অন্যতম প্রাণিজ সম্পদ। এটি এদেশবাসীর প্রিয় খাদ্য। এ সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। এদেশের পুকুর, বিল, হাওর, বাঁওড়, নদী ও সমুদ্র থেকে প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এদেশের মাছের পরিমাণ খুবই কম।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন, (ক) **অভ্যন্তরীণ মৎস্য ও** (খ) **সামুদ্রিক মৎস্য**। ধৃত মৎস্যের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মৎস্যের পরিমাণই বেশি।

(ক) অভ্যন্তরীণ মৎস্য : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্য সাধারণত পুকুর, বিল, হাওর, বাঁওড় এবং নদী থেকে ধরা হয়। পুকুরে প্রধানত রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, শিং, মাগুর, সরপুঁটি প্রভৃতি মাছের চাষ করা হয়। চিতল, বোয়াল, শোল ও গজার অন্য মাছ খেয়ে ফেলে বলে এদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলা হয়। বিদেশ থেকে আনা তেলাপিয়া ও নাইলোটিকা মাছও পুকুরে দ্রুত বংশ বিস্তার করে। বিল, হাওর, বাঁওড় ইত্যাদি থেকে রুই, কাতলা, মৃগেল, কই, শিং, মাগুর, টাকি, শোল, গজার, বোয়াল, চিতল, কাজলি, পাবদা, চিংড়ি প্রভৃতি মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ইলিশ সামুদ্রিক মৎস্য হলেও ডিম পাড়ার জন্য এদের নদীতে আসতে হয়। এজন্য ইলিশ সাধারণত নদীতে পাওয়া যায়।

মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্র : আশুগঞ্জ, ভৈরববাজার, চাঁদপুর, ষাটনল, মুন্সিগঞ্জ, গোয়ালন্দ, আরিচা, ভাগ্যকূল, সিরাজগঞ্জ, কুলিয়ারচর, বরিশাল, খেপুপাড়া, গোপালগঞ্জ, রাঙামাটি, কাপ্তাই ইত্যাদি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্র (চিত্র ৯.১)।

(খ) সামুদ্রিক মৎস্য : বাংলাদেশের উপকূল ভাগে অসংখ্য নদী মোহনা ও খাড়ি বর্তমান। এসব নদী মোহনা ও খাড়ি সামুদ্রিক মৎস্যের বসবাস, বিচরণ এবং প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে খুবই সহায়ক। তাই উপকূলবর্তী সমুদ্রে প্রচুর মাছ ধরা হয়।

সামুদ্রিক মৎস্যের মধ্যে রুপচান্দা, ছুরি, লাটিয়া, লাক্ষা, গলদাচিংড়ি, হাঙর, ভেটকি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব মাছের মধ্যে রুপচান্দা ও লাক্ষা সুস্বাদু। হাঙর মাছের তেলের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। বিশ্ববাজারে চিংড়ির চাহিদা প্রচুর।

মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্র : সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ, কক্সবাজার, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, মহেশখালি, চট্টগ্রাম, দুবলার চর, রাঙাবালি ও বড় বাইশদিয়া প্রভৃতি প্রধান সামুদ্রিক মৎস সংগ্রহ কেন্দ্র।

বাণিজ্য : বাংলাদেশে মাছের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রতিবছর বিশ্ববাজারে মাছ রপ্তানি করে। রপ্তানিকৃত মাছের মধ্যে চিংড়ি, ইলিশ ও কিছু সামুদ্রিক মাছ প্রধান।



চিত্র ৯.১ : বাংলাদেশের মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্রসমূহ

খনিজ সম্পদ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। খনিজ সম্পদে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ নয়, তবে এখানে কতিপয় প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে **কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, শ্বেতমৃত্তিকা, কাচবালি, চুনাপাথর** প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কয়লা : বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জ; দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ, বগুড়া জেলার কুচমা প্রভৃতি স্থানে উন্নতমানের কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া গোপালগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ময়মনসিংহ জেলায় পীট জাতীয় কয়লা রয়েছে। বর্তমানে এসব স্থান থেকে কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা হচ্ছে (চিত্র ৯.২)।

প্রাকৃতিক গ্যাস : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। রান্নার কাজে, শিল্প কারখানায়, জ্বালানি হিসেবে এবং সার কারখানার কাঁচামাল হিসেবে এ গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ২৩টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলেও বর্তমানে ১৭টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১২২, ১২৩)। এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো হল বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, হরিপুর, জালালাবাদ, বিয়ানীবাজার, রশীদপুর, তিতাস, বেলাবো, মেঘনা, হালদানদী ও সাঙ্গু। এদের মধ্যে তিতাস সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র। এছাড়া সেমুতাং, কুতুবদিয়া, বেগমগঞ্জ, ফেনী, ফেঞ্চুগঞ্জ, ছাতক, কামতা, শাহবাজপুর, বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার প্রভৃতি স্থানেও গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে। (চিত্র ৯.২)।

খনিজ তেল : সিলেটের হরিপুর ও মৌলভীবাজারের বরমচালে খনিজ তেলক্ষেত্র রয়েছে। বর্তমানে এ দুইটি তেলক্ষেত্র থেকে খনিজ তেল উত্তোলিত হয় (চিত্র ৯.২)।

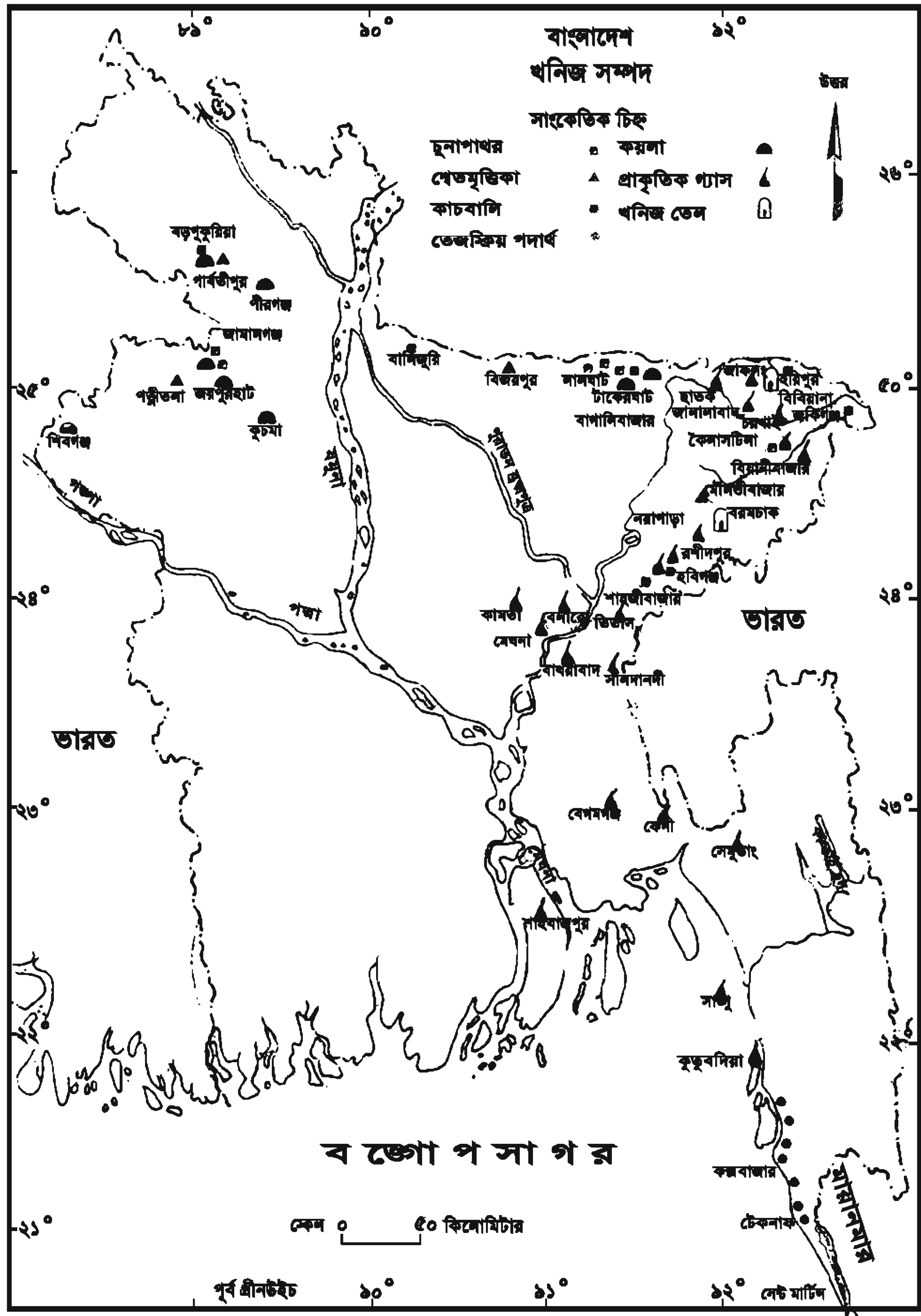
চুনাপাথর : সিমেন্ট, কাচ, সাবান, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরঘাট, লালঘাট ও বাগালিবাজার; সিলেট জেলার জাফলং, জকিগঞ্জ ও চরখাই, জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন্স দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া যায় (চিত্র ৯.২)।

শ্বেতমৃত্তিকা : দেশের বিভিন্ন মৃৎশিল্প কারখানায় থালাবাসন প্রস্তুতের জন্য এ মৃত্তিকার প্রয়োজন হয়। ময়মনসিংহের বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা ও দিনাজপুরের পার্বতীপুরে শ্বেতমৃত্তিকা পাওয়া যায়।

কাচবালি : কাচ তৈরিতে কাচবালি ব্যবহৃত হয়। সুনামগঞ্জের টাকেরঘাট, হবিগঞ্জের শাহবাজার ও নয়াপাড়া; শেরপুরের বালিজুরি ও দিনাজপুরের পার্বতীপুরে কাচবালি পাওয়া যায়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ : কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সমুদ্রে সৈকতের বালিতে প্রচুর তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে জিরকন, ইলমেনাইট, মোনাজাইট ও জাহেরাইট উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী এম. এ জাহের আবিষ্কৃত পদার্থটিকে তাঁর নাম অনুসারে জাহেরাইট রাখা হয়েছে।

অন্যান্য খনিজ সম্পদ : এছাড়া রংপুর ও দিনাজপুরে কঠিন শিলা এবং সিলেট ও লালমনিরহাটে নুড়িপাথর পাওয়া যায়।



চিত্র ৯.২ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

কৃষিজ সম্পদ

বিস্তীর্ণ সমভূমি, উর্বর মাটি ও বৃষ্টিবহুল আর্দ্র জলবায়ু বাংলাদেশকে একটি উৎকৃষ্ট কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য এদেশের শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ (বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৬) লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে নানা ধরনের কৃষিজ ফসল উৎপন্ন হয়। এসব কৃষিজ ফসলকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন,
(ক) খাদ্যশস্য ও (খ) অর্থকরী ফসল।

(ক) খাদ্যশস্য : কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে কৃষিজ পণ্যগুলোর মধ্যে খাদ্যশস্য অন্যতম। বাংলাদেশে কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। এদেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে **ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, যব** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশ খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

ধান : বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ধান ভাল হয়। এদেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ আবাদী জমিতে ধানের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত তিন ধরনের ধান জন্মে। যেমন, আউশ, আমন ও বোরো। আউশ ধান উঁচুভূমিতে, আমন ধান অপেক্ষাকৃত নিচুভূমিতে এবং বোরো ধান জলাশয়, বিল, হাওরসহ বিভিন্ন ধরনের জমিতে চাষাবাদ করা হয়। বর্তমানে উচ্চফলনশীল বিভিন্ন প্রকার ইরি ও বিরি ধানের চাষ হচ্ছে যার ফলন হেকটর প্রতি ১৮ থেকে ৩৬ কুইন্টাল (চিত্র ৯.৩)।

পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং বনভূমি ছাড়া দেশের প্রায় সর্বত্রই কমবেশি ধানের চাষ হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধান হিসেবে বরিশাল ও পটুয়াখালি অঞ্চলের বালাম, দিনাজপুর অঞ্চলের কাটারিভোগ, ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিরই ধান এবং নোয়াখালি ও কুমিল্লা অঞ্চলের কালিজিয়া, ইছাগুঁড়া, চিনিগুঁড়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

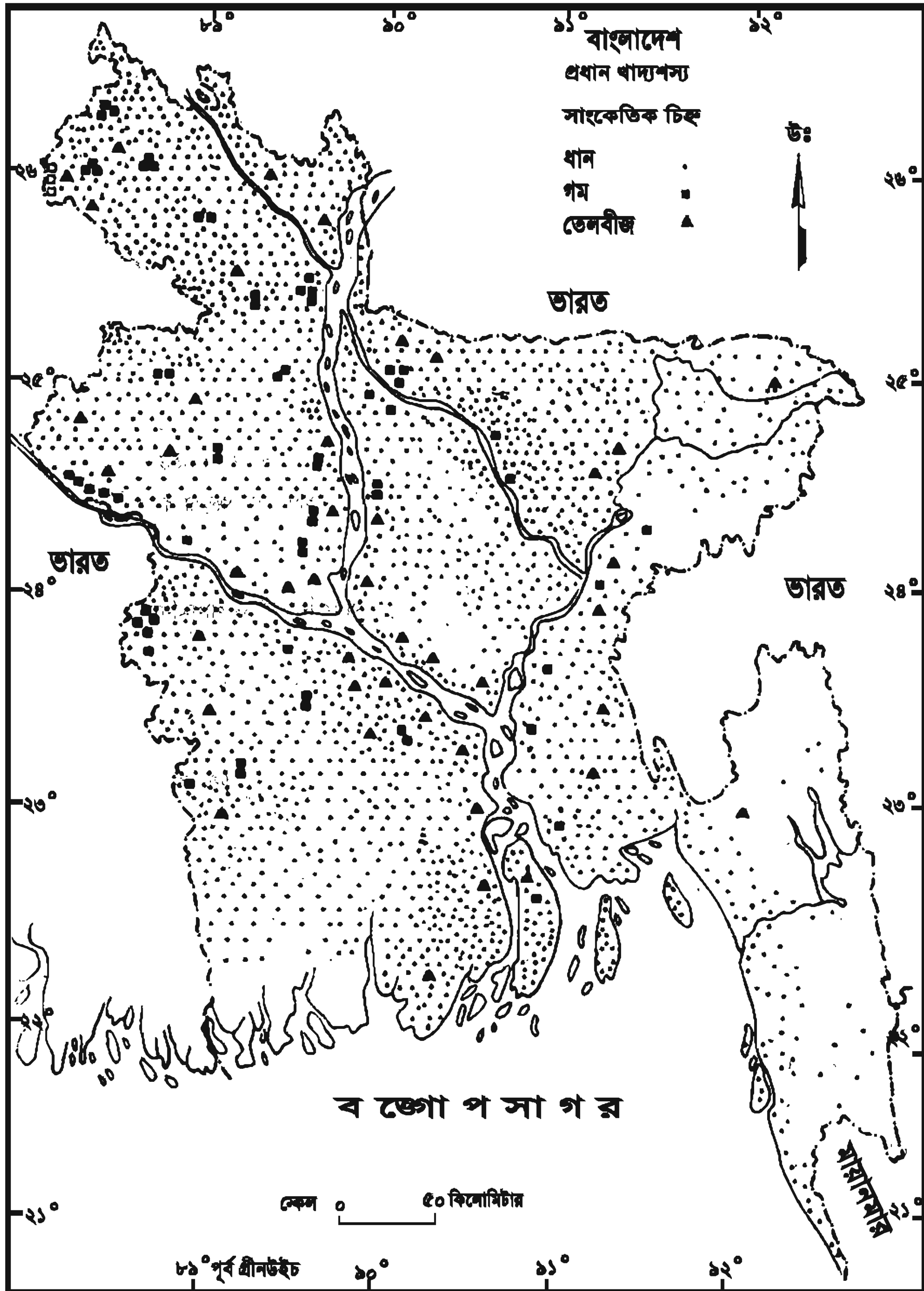
গম : গম বাংলাদেশে দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। রংপুর, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও পাবনা অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি গম উৎপন্ন হয়। এছাড়া ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া অঞ্চলেও গমের চাষ হয় (চিত্র ৯.৩)।

ডাল : ডাল বাংলাদেশের সাধারণ আমিষ জাতীয় খাদ্য। এ ফসল রবিশস্যের অন্তর্গত এবং দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। ডাল জাতীয় শস্যের মধ্যে ছোলা, মসুর, খেসারি, মুগ, মাসকলাই, অড়হর প্রভৃতি দেশের প্রায় সর্বত্রই জন্মে।

তেলবীজ : বাংলাদেশে উৎপন্ন তেলবীজের মধ্যে সরিষা, তিল, তিসি, বাদাম প্রভৃতি প্রধান। ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচুর তেলবীজ উৎপন্ন হয়। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া চীনাবাদাম চাষে খুবই উন্নত (চিত্র ৯.৩)।

অন্যান্য খাদ্যশস্য : খাদ্যশস্যের মধ্যে ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা যব প্রভৃতি শুষ্ক ঋতুর প্রধান শস্য। এসব ফসলের মধ্যে ভুট্টার উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

বাণিজ্য : বাংলাদেশ ধান, গম, তেলবীজ প্রভৃতি খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে প্রতিবছর বিশ্ববাজার থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।



চিত্র ৯.৩ : বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য

অর্থকরী ফসল

যেসব ফসল সরাসরি বিক্রির উদ্দেশ্যে চাষ করা হয় তাদের **অর্থকরী ফসল** বলে। বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে **পাট, চা, আখ, তামাক** প্রভৃতি প্রধান।

পাট : পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শিল্পোন্নয়নে এর অপরিসীম গুরুত্বের জন্য পাটকে বাংলাদেশের **'সোনালি আঁশ'** বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় এক –তৃতীয়াংশ পাট এদেশে জন্মে।

আমাদের দেশে দুই ধরনের পাট জন্মে। তোষাপাট ও দেশীপাট। তোষাপাট উঁচুজমিতে ও দেশীপাট নিচুজমিতে বপন করা হয়। এদেশে ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত পাটের চাষ হয় এবং আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত পাট কাটা হয়। পাট পচানোর জন্য আঁটি বেঁধে ১৫ থেকে ২০ দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। পাট পঁচার পর কাঠি থেকে আঁশ পৃথক করে শুকিয়ে বাজারে বিক্রি করা হয়।

পাহাড়িয়া এলাকা ও লোনা পানি প্রভাবিত উপকূলবর্তী এলাকা ব্যতীত বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কিছু না কিছু পাট জন্মে। এর মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রংপুর, ফরিদপুর, যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে অধিক পাট জন্মে (চিত্র ৯.৪)।

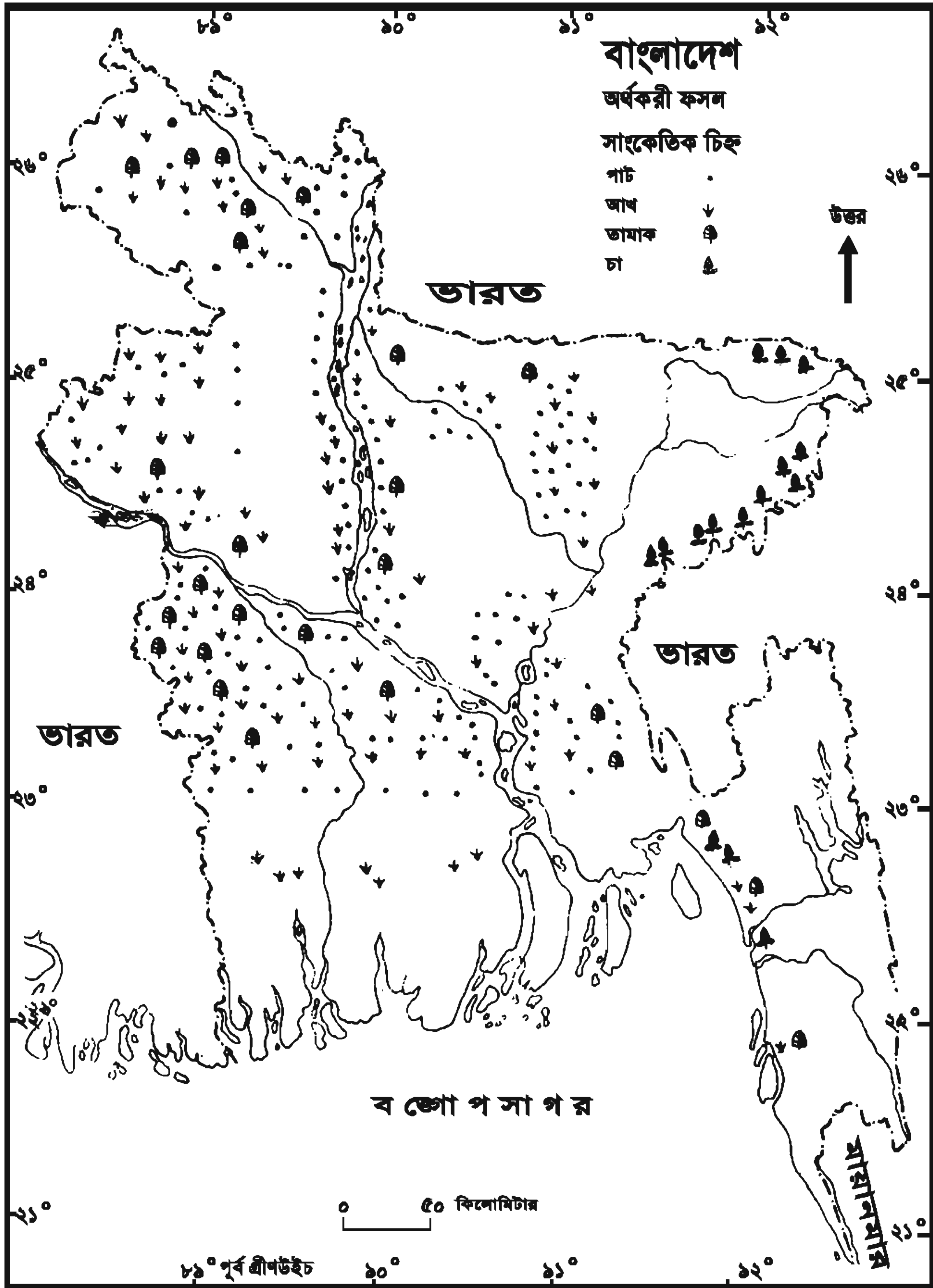
পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

চা : চা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল। চা চাষের জন্য প্রচুর তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং পানি নিষ্কাশনযোগ্য ঢালু জমির প্রয়োজন। এ কারণে সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে এবং রাঙামাটির পাহাড়ের ঢালে চা এর বাগান গড়ে উঠেছে। সিলেট অঞ্চলে দেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ চা উৎপন্ন হয় (চিত্র ৯.৪)। জঙ্গল পরিষ্কার করে পাহাড়ের ঢালে চা গাছের চারা সারি করে লাগানো হয়। ৩ বা ৪ বছরের মধ্যে গাছগুলো পাতা সংগ্রহের উপযোগী হয়। চা গাছ প্রায় ৭ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে হাত দিয়ে পাতা তুলতে হয় বলে গাছকে ছেটে এক থেকে দেড় মিটারের মধ্যে রাখা হয়। এদেশে বৈশাখ থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত ১৫ থেকে ২০ দিন পর পর চা পাতা সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫৮টি চা বাগান রয়েছে।

আখ : চিনি উৎপাদনের কাঁচামাল আখ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। আখ থেকে চিনি ও গুড় উৎপাদিত হয়। এদেশের উর্বর মাটি ও আর্দ্র জলবায়ু আখ চাষের উপযোগী। ফলে এদেশে প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু আখ জন্মে। আখ উৎপাদনে রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর ও ময়মনসিংহ অঞ্চল বিশেষ প্রসিদ্ধ (চিত্র ৯.৪)।

তামাক : উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং হালকা দোআঁশ মাটিতে তামাকের ফলন ভাল হয়। এদেশের প্রায় সবর্ত্রই কিছু না কিছু তামাকের চাষ হয়। রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চল তামাক চাষে প্রসিদ্ধ (চিত্র ৯.৪)।

অন্যান্য অর্থকরী ফসল : এদেশে পান, সুপারি, রেশম, তুলা প্রভৃতি অর্থকরী ফসলও জন্মে।



চিত্র ৯.৪ : বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল

যাতায়াত ব্যবস্থা

উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা ছাড়া কোনো দেশই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করতে পারে না। কারণ কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা তিন প্রকার– (ক) **জলপথ**, (খ) **স্থলপথ** ও (গ) **বিমানপথ**।

(ক) জলপথ : বাংলাদেশে দুই ধরনের জলপথ রয়েছে। যথা– (১) নদী ও খালপথ এবং (২) উপকূলীয় সমুদ্রপথ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বহু নদী, খাল, বিল ইত্যাদি রয়েছে। তাই জলপথ যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপগুলোতে সমুদ্রপথে যাতায়াত ও পরিবহণ কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে নদীপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার। কিন্তু শীতকালে এ পথের দৈর্ঘ্য অনেক কমে যায়। নদীপথে স্টিমার, লঞ্চ ও নৌকায় যাত্রী ও মালামাল পরিবাহিত হয়।

(খ) স্থলপথ : স্থলপথ দুই প্রকার। যথা – **রেলপথ ও সড়কপথ** (চিত্র ৯.৫)।

রেলপথ : বাংলাদেশে ব্রডগেজ, মিটারগেজ ও ডুয়েলগেজ রেলপথ রয়েছে। ব্রডগেজ রেলপথ শুধু যমুনা নদীর পশ্চিমাংশে এবং মিটারগেজ রেলপথের অধিকাংশই যমুনা নদীর পূর্বাংশে অবস্থিত। বর্তমানে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ২৮৩৫.০৪ কিলোমিটার। এর মধ্যে ব্রডগেজ রেলপথ ৬৫৯.৩৩ কিলোমিটার এবং মিটারগেজ রেলপথ ১৮০০ কিলোমিটার, ডুয়েলগেজ ৩৭৪.৮৩ কিলোমিটার (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৬৪)।

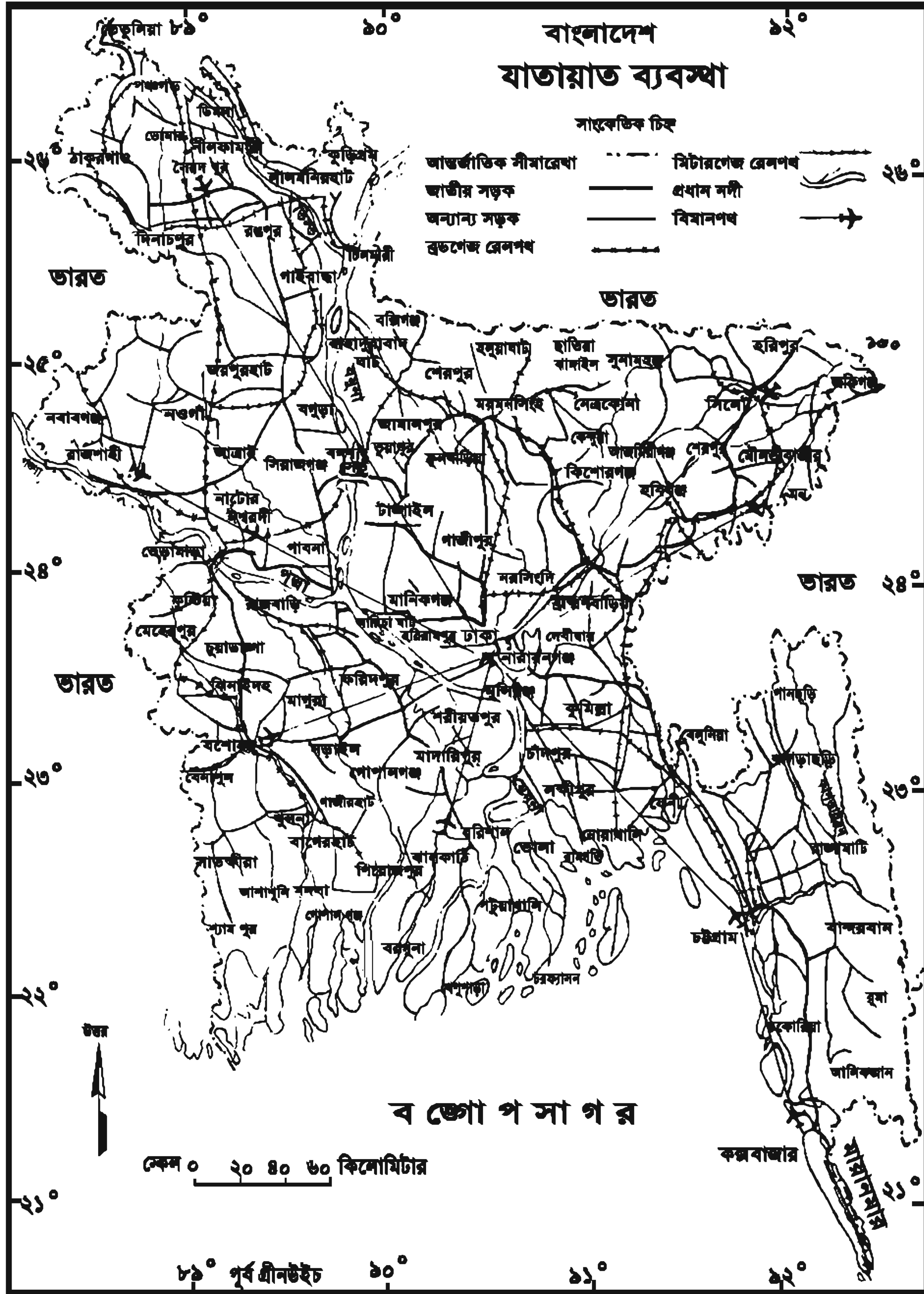
বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৫৪ টি রেল স্টেশন আছে (উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই, ২০০৭, সারণি ৮.০১)। এর মধ্যে **ঢাকা, চট্টগ্রাম, লাকসাম, আখাউড়া, কুলাউড়া, ময়মনসিংহ, ভৈরববাজার, ঈশ্বরদী, পার্বতীপুর, সান্তাহার, বোনারপাড়া ও কাউনিয়া** জংশনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেলপথে রাজধানী ঢাকা থেকে দেশের প্রায় সকল গুরত্বপূর্ণ শহরে যাতায়াত করা যায়।

সড়কপথ : নদী ও খালবিলের দরুন বাংলাদেশে সড়কপথ নির্মাণ খুবই কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল হলেও দেশে প্রায় ১৯১৮৭৪ কিলোমিটার সড়কপথ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে প্রায় ৫৯৭৩৫ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং অবিশষ্ট রাস্তা আধাপাকা ও গ্রাম্য কাঁচারাস্তা (উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই, ২০০৭, সারণি ৮.০৩)। শুষ্ক ঋতুতে কাঁচারাস্তা মোটর চলাচলের যোগ্য থাকে। কিন্তু বর্ষার দিনগুলোতে তা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। রাজধানী ঢাকা থেকে সড়কপথে দেশের প্রায় সর্বত্রই যাতায়াত করা যায়।

(গ) বিমানপথ : বাংলাদেশ একটি ছোট্ট ও অনুন্নত দেশ। তাই অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখানে স্থল ও জলপথের মত বিমানপথ তেমন উন্নতি লাভ করেনি। অভ্যন্তরীণ বিমানপথ মূলত যাত্রী পরিবহণ করছে।

অভ্যন্তরীণ পথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, যশোর, বরিশাল, রাজশাহী, ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর ও ঠাকুরগাঁও ভ্রমণ করা যায়। কুর্মিটোলায় অবস্থিত **'জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'** দেশের প্রধান বিমানবন্দর।

চট্টগ্রাম শাহ আমানত ও সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিমান সংস্থা আন্তর্জাতিক পথে বর্তমানে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করছে (চিত্র ৯.৫)।



চিত্র ৯.৫ বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা

অনুশীলনী

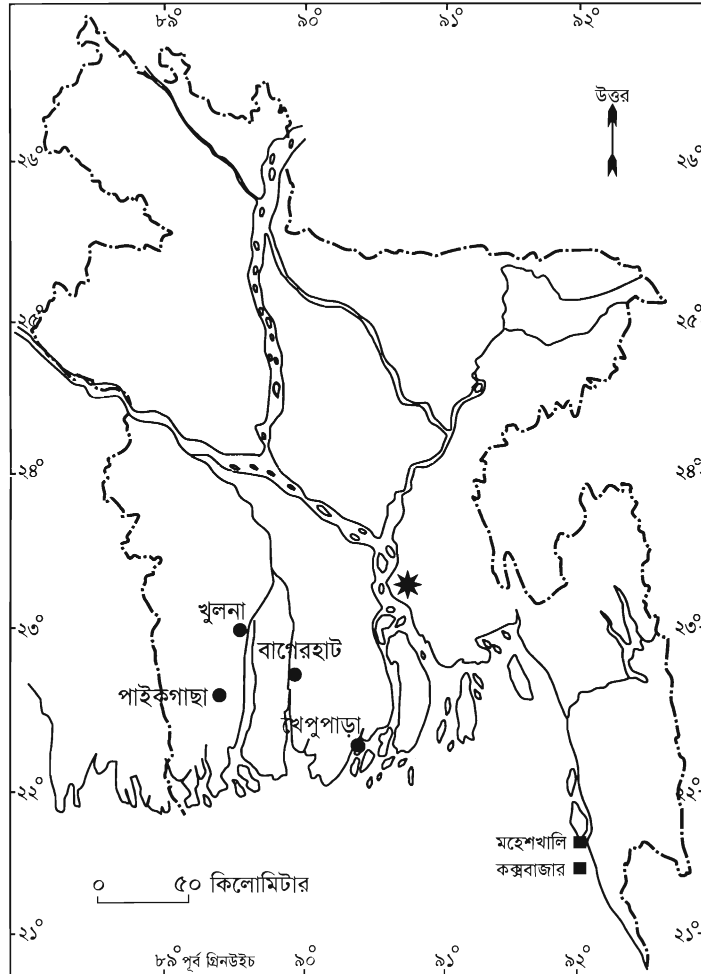
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিশ্ব বাজারে প্রচুর চাহিদা কোন মাছের?

ক. রূপচাঁদা খ. হাঙর

গ. ইলিশ ঘ. চিংড়ি

মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



২. তারকা চিহ্নিত স্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ কেন্দ্র এর নাম কী?

ক. গোয়ালনন্দ খ. চাঁদপুর

গ. আরিচা ঘ. খেপুপাড়া

৩. বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রপ্তানিকৃত মৎস্য চারণ ক্ষেত্রগুলো হল–

ক. কক্সবাজার, কুতুবদিয়া, পাইকগাছা খ. সেন্টমার্টিন্স দ্বীপ, মহেশখালি, খুলনা

গ. গোয়ালন্দ, দুবলার চর, রাঙাবালি ঘ. মহেশখালি, পাইকগাছা, কুতুবদিয়া

একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর চা পাতা সংগ্রহ করা হয়। এই চা চাষের জন্য প্রচুর তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং নিষ্কাশনযোগ্য ঢালু জমির প্রয়োজন।

৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান গড়ে উঠেছে–
   ক. সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে
   খ. সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা অঞ্চলে
   গ. কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার অঞ্চলে
   ঘ. চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা অঞ্চলে

৫. চা পাতা কত দিন পর পর সংগ্রহ করা হয়?
   ক. ১০–১৫ দিন
   খ. ১৫–২০ দিন
   গ. ২০–২৫ দিন
   ঘ. ২৫–৩০ দিন

৬. নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ সম্পদটি হল–
   ক. শ্বেতমৃত্তিকা
   খ. কঠিন শিলা
   গ. চুনাপাথর
   ঘ. কাচবালি

৭. বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য খাদ্য শস্য হল–
   ক. ধান, গম, ভুট্টা, বাদাম
   খ. ধান, গম, ডাল, তেলবীজ
   গ. ধান, গম, সরিষা, বাদাম
   ঘ. ধান, গম, মসুর, বাদাম

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তানভীর কখনই রেলপথে ভ্রমণ করেনি। এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে ঢাকা থেকে তার নানুর বাড়ি পঞ্চগড়ে ট্রেনে যাবে বলে ঠিক করেছে। তাই সে বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার মানচিত্রটি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে।
   ক. বাংলাদেশে কয় ধরনের রেলপথ রয়েছে?
   খ. যমুনা নদীর পূর্বাংশে এবং পশ্চিমাংশে কী কী ধরনের রেলপথ বিদ্যমান তা বর্ণনা কর।
   গ. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে ঢাকাসহ উত্তরাঞ্চলের যে কোনো ১টি উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে জংশন চিহ্নিত কর।
   ঘ. বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে কোন মাধ্যম সহজ এবং কম ব্যয় বহুল বলে তুমি মনে কর? এর স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২. তানিয়া দাদুর সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। গ্রামের মাটির রাস্তার দুই পাশে পাটক্ষেত ও ধানক্ষেত দেখে সে খুব আনন্দ পায়। তানিয়া মনে মনে ভাবতে থাকে এদেশের বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের কথা।
   ক. বাংলাদেশে কয় ধরনের কৃষিজ সম্পদ রয়েছে?
   খ. পাহাড়িয়া অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এমন একটি অর্থকরী ফসলের বর্ণনা দাও।
   গ. পাট, চা, আখ, তামাক এই চারটি অর্থকরী ফসলের সঙ্গে তাদের দুইটি উৎপাদিত অঞ্চলের নাম উল্লেখপূর্বক একটি চার্ট তৈরি কর।
   ঘ. 'অর্থকরী ফসলসমূহ কীভাবে এদেশের জনজীবনকে প্রভাবিত করছে'– তা ব্যাখ্যা কর।

৩. আশুগঞ্জ, ভৈরব বাজার, চাঁদপুর, ষাটনল, কাপ্তাই, রাঙামাটি, সেন্টমার্টিন্স দ্বীপ, কক্সবাজার, সোনাদিয়া, মহেশখালি, চট্টগ্রাম, দুবলার চর।
   ক. উপরিল্লিখিত স্থানসমূহ কোন দেশের মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্র?
   খ. উপরিউক্ত স্থানসমূহে অভ্যন্তরীণ মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্র এবং সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্র এ দুভাবে সাজিয়ে লেখ।
   গ. গুচ্ছ সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদের তিনটি সংগ্রহ কেন্দ্র মানচিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।
   ঘ. বাংলাদেশে মাছের ব্যাপক ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও মাছ রপ্তানিকে তুমি কী সমর্থন কর? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

দশম অধ্যায়

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা পরিস্থিতি

জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ সমস্যা বেশি ভয়াবহ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের এক হিসেব অনুযায়ী ৫০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ কোটির মধ্যে ছিল। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে এই জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৫০ কোটিরও কিছু বেশিতে দাঁড়ায়। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের পর গত তিন শতাব্দীব্যাপী সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা তিন বার দ্বিগুণ হয়েছে। ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১০০ কোটি, এরপর ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ২০০ কোটি এবং ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তা ৪০০ কোটিতে দাঁড়ায়। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের হিসাব মতে দেখা যায় ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দে এই জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ৮০০ কোটিতে দাঁড়াবে। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটিতে পৌঁছেছে, যা ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের জনসংখ্যার প্রায় বারো গুণ। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ বৃদ্ধি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এই জনস্ফীতিকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নামে অভিহিত করা যায়। আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলোসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে।

বর্তমান পৃথিবীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, সংক্রামক রোগ ও মহামারী প্রতিরোধ, প্রতিষেধক আবিষ্কার, পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহারসহ, শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। ফলে মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। নবজাতক ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে উন্নত দেশগুলোতে জন্মহার বৃদ্ধি কিছুটা কমলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ হারের তেমন পরিবর্তন হয়নি। এর কারণ পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর ১৯৭৪ সালের আদমশুমারির হিসেব হতে দেখা যায় যে এ দেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭.৬৪ কোটি। ২০০১ সালে এই জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১২.৯৩ কোটি। অর্থাৎ, ২৭ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ৫.২৮ কোটি। ২০০১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৪৮%*। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় কম। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৬ লাখ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১। তবে এই হারে বাড়তে থাকলেও ২০১০ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা আনুমানিক ১৫ কোটি হবে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন লেখাচিত্রের সাহায্যে অপর পৃষ্ঠায় দেখানো হল।

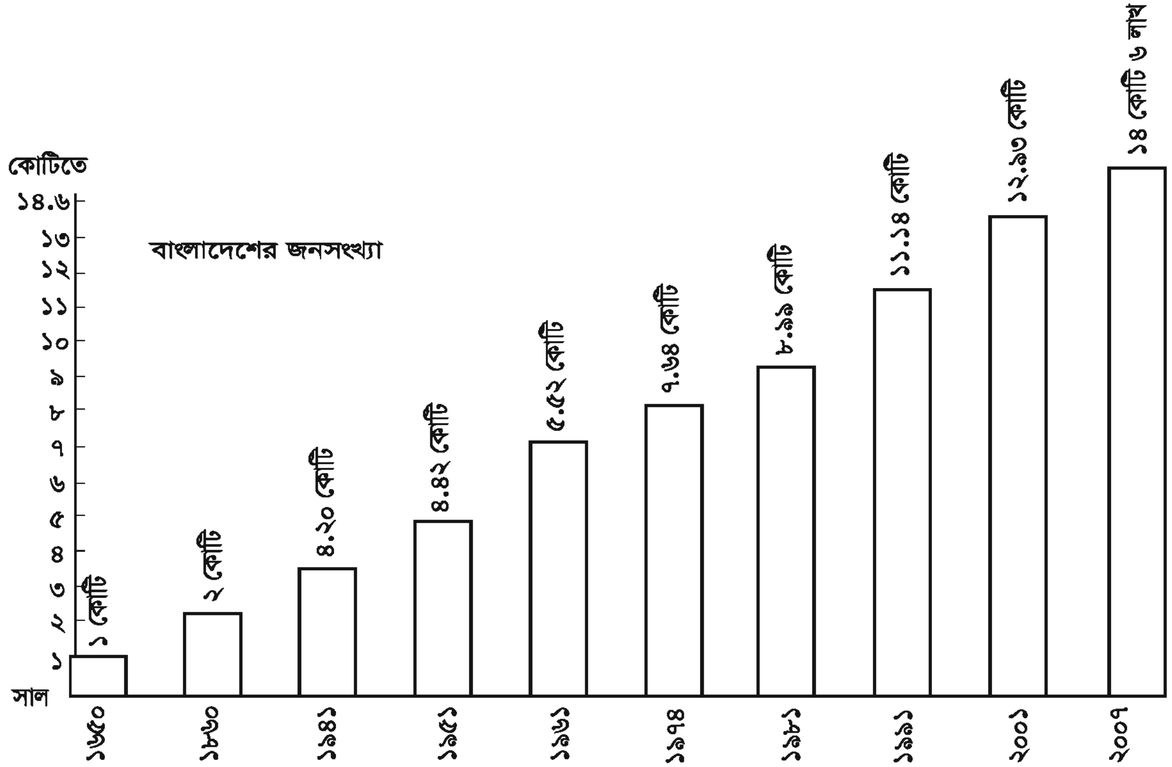
পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত রেখা চিত্র হতে দেখা যায় যে, আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৫.৫২ কোটি এবং ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.১৫ কোটিতে। অর্থাৎ, দেশের জনসংখ্যা এই ৩০ বছরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অতীতে কিন্তু এত দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। চিত্রে লক্ষ করা যায় যায়, ১৮৬০ সালে বাংলাদেশ ভূ–খণ্ডে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি। ১৯৪১ সালে তা হয়েছে ৪.২০ কোটি। অর্থাৎ ৮০ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। তারও আগে দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে প্রায় দু'শ বছর।

---

*   আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট, আগস্ট, ২০০১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

** আদমশুমারি ১৯৯১

*** **উৎস :** বিবি এস ২০০৭।



চিত্র ১০.১ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন একক কারণ নেই। অনেক কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করা হল :

জন্মহার ও মৃত্যুহারের ব্যবধান

জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু। কোন দেশে বছরে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তার চেয়ে কম সংখ্যক মারা গেলে সে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে যত শিশু জন্মলাভ করে তার চেয়ে বেশি লোক মারা গেলে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। আর জন্ম ও মৃত্যু সমান হলে জনসংখ্যা স্থির থাকে। এ থেকে বুঝা যায় যে, জন্ম ও মৃত্যুর ফলেই মূলত জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের হার স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রতি বছর কোন অঞ্চল বা দেশে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে যে সংখ্যক জীবিত শিশু জন্মলাভ করে তাই সে অঞ্চল বা দেশের স্থূল জন্মহার। প্রতি বছর কোন অঞ্চল বা দেশে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে যে সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করে তাই সে অঞ্চলের স্থূল মৃত্যুহার। যখনই স্থূল জন্মহার স্থূল মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখনই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

এক হিসাব অনুযায়ী এ দেশে প্রতি বছর জন্ম নিচ্ছে ২৫ লক্ষ শিশু এবং মৃত্যুবরণ করছে সকল বয়সের প্রায় ৬ লক্ষ লোক। ফলে প্রতি বছর প্রায় ১৯ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল একদিকে উচ্চ জন্মহার ও অন্যদিকে নিম্ন মৃত্যুহার।

উৎস : বিবিএস ২০০৭

মৃত্যুহার হ্রাস

মৃত্যুহার হ্রাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। পূর্বে পৃথিবীব্যাপী, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশু মৃত্যুহার অধিক ছিল। হাম, পোলিও, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটত। কিন্তু এ সমস্ত মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে অনেক শিশু অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে। খাবার স্যালাইনের ব্যবহারের ফলে অনেক শিশু অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। মাতৃমঙ্গল কর্মসূচি হাতে নেওয়ার ফলে প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হারও কমে গেছে। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি সংক্রামক রোগ পূর্বে মহামারীরূপে দেখা দিত, হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করত। কিন্তু এখন প্রতিষেধক আবিষ্কার হওয়ায় মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনংসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১ সালে আমাদের দেশে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬০.৮। আয়ুষ্কালের এই বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করছে। শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে স্বাস্থ্য শিক্ষারও প্রসার ঘটেছে। মানুষ খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে ধারণা লাভ করছে। সুষম খাদ্য গ্রহণের উপকারিতা বুঝতে পারছে। ফুটানো পানি এবং টিউবওয়েলের আর্সেনিক মুক্ত ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার শিখেছে। জনগণ স্বাস্থ্যকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দূষণমুক্ত পরিবেশে থাকার চেষ্টা করছে। ফলে রোগমুক্ত দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হচ্ছে। এভাবে মৃত্যুহার ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কিন্তু জন্মহারের খুব বেশি পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ এ দেশে প্রচলিত। বাল্য বিবাহের কারণে শিশু জন্মহার বৃদ্ধি পায়। ফলে অপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বসতি স্থানান্তর

জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে বসতি স্থানান্তর। দুইদেশের মধ্যে অধিবাসীদের স্থানান্তরকে দেশান্তর বলে। দেশান্তর দুইরকম– বহিরাগমন ও বহির্গমন। দেশের বাইরে থেকে দেশে লোকের আগমনকে বহিরাগমন বলে। বহিরাগমনের ফলে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। কোনো দেশ থেকে লোকের অন্য দেশে গমনকে বহির্গমন বলে। বহির্গমনের ফলে জনসংখ্যা কমে যায়। কোনো দেশে বহির্গমনের চেয়ে বহিরাগমন বেশি হলে সে দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যায়।

দেশের ভেতর অনেক সময় এক এলাকার লোক অন্য এলাকায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এটাকে বলে আন্তঃস্থানান্তর। এই অবস্থায় প্রথম এলাকার জনসংখ্যা কমে যায় ও দ্বিতীয় এলাকার জনসংখ্যা বেড়ে যায়। এভাবে বাসস্থান পরিবর্তন বা স্থানান্তরের জন্য বিভিন্ন এলাকার জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। যেমন মনে কর, তোমরা সিলেটের বাসিন্দা ছিলে কিন্তু বর্তমানে সবাই ঢাকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছ। এতে সিলেটের জনসংখ্যা কমে গেল এবং ঢাকার জনসংখ্যা বেড়ে গেল। তবে আন্তঃস্থানান্তরে দেশে মোট জনসংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না। দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে তখনই যখন অন্য দেশ থেকে বহিরাগমন ঘটে।

গ্রাম ও ইউনিয়নভিত্তিক জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির খতিয়ান

দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতির মত কোনো এলাকার জনসংখ্যা পরিস্থিতিও জানা যায়। যে কোনো এলাকার জনসংখ্যা, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির হিসেব সংগ্রহ করে এক বছরে কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা জানা যায়। এতে পরিবর্তনের ক্রমধারাও অতি সহজে বোঝা যায়। জন্ম, মৃত্যু দেশান্তরের হিসেব ইত্যাদি তথ্য সাধারণ পল্লী অঞ্চলে ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহরে পৌর করপোরেশন বা পৌরসভা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে।

মনে কর, তোমার নিজ গ্রামের ৪ বছরের জনসংখ্যার পরিবর্তন সম্বন্ধে তোমাকে জানতে হবে। তখন তুমি নিচের ছক অনুযায়ী গ্রাম বা মহল্লার বিভিন্ন পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সহজেই তা জানতে পারবে।

.... গ্রামের ইউনিয়নের ৪ বছরের জনসংখ্যা পরিবর্তনের তথ্য

ক্রমিক নং	পরিবার প্রধানের নাম ও ঠিকানা	৪ বছর পূর্বে পরিবারের লোকসংখ্যা	৪ বছরে বাড়ল		৪ বছরে কমলো		মোট		পরিবারের বর্তমান লোক সংখ্যা
			৪ বছরে জন্মেছে	৪ বছরে বাইরে অথবা অন্য পরিবার থেকে এসেছে	৪ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে	৪ বছরের মধ্যে বাইরে অথবা অন্য পরিবারে চলে গেছে	বাড়ল	কমলো	

মোট পরিবার .... টি

পরিবারের বর্তমান লোকসংখ্যা = ... জন

৪ বছর পূর্বে পরিবারের লোকসংখ্যা = ... জন

৪ বছরে লোকসংখ্যা বাড়ল/কমল = ... জন

জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নিম্নে বর্ণিত সমস্যা সৃষ্টি হয় :

(ক) পরিবারের আয় অপরিবর্তিত থেকে লোকসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে পরিবারে অসচ্ছলতা দেখা দেয়।

(খ) নির্দিষ্ট আয়ের পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু আয় কমে যায়।

(গ) সীমিত আয়ের পরিবারের জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পেলে পরিবারের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়।

(ঘ) পরিবারের লোকসংখ্যার আধিক্যের কারণে অনেক সন্তানই শিক্ষার সুযোগ পায়না। কেননা সরকার বা সমাজের পক্ষে এরূপ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে সুযোগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

(ঙ) নির্দিষ্ট আয়ের পরিবারে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সকলেই দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে পড়ে।

জনসংখ্যাজনিত সমস্যা সমাধানের উপায়

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবার ও দেশে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় তা সমাধানের প্রধান উপায় হল
প্রথমত, বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণের যে আইন করা হয়েছে (পুরুষের জন্য ২১ বছর এবং মেয়েদের জন্য ১৮ বছর) তা পুরোপুরি কার্যকর করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, নারী সমাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মজীবী মহিলারা সাধারণত অধিক সন্তান জন্মদানে আগ্রহী নন। তাই মহিলারা অধিক পরিমাণে উৎপাদনমুখী কাজকর্মে অংশগ্রহণ করলে স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা কমে যাবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষা মানুষকে সমাজ সচেতন করে এবং জীবন-যাত্রার উচ্চমান সম্পর্কে আগ্রহী করে। এজন্য আমাদের দেশে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ কর্মসূচী আরো জোরদার করতে হবে।

চতুর্থত, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দান ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে মা-বাবাকে সদা সচেতন থাকতে হবে। এই সচেতনতা আনার জন্য সামাজিকভাবে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই কর্মসূচিতে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রাথমিক ধারণা, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পঞ্চমত, ছোট পরিবারের উপকারিতা সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। ছোট পরিবারের সুযোগ-সুবিধা যেমন- পুষ্টিকর ও পরিমিত খাদ্য, উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎসার সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে।

নারীদের প্রতি সমাজের ভ্রান্ত ধারণা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এর সম্পর্ক

আমাদের দেশে মেয়েরাই পরিবারের অধিকাংশ কাজ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্তান কামনায় মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তানই প্রাধান্য পায়। সমাজে মেয়েদের বিষয়ে কতগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কারণে এই মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধান করতে হলে এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো নিরসন করা দরকার। নিচে ধারণাগুলো আলোচনা করা হল।

মেয়েদের সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস এই যে, তারা উপার্জন করতে পারেনা। কিন্তু তাদের প্রতি দিনের কাজের তালিকা দেখলে একথা বিশ্বাস করা যায়না। মেয়েরা ও মায়েরা ছেলে-মেয়েদের লালন পালন করে ও গৃহস্থালীর সব কাজ করে। সাধারণত গ্রাম এলাকার মহিলারা হাঁস-মুরগি ও পশু পালন করে। পরিবারের কৃষি উৎপাদনের কাজে অংশ নেয়, সবজি বাগান করে। কুটির শিল্পের কাজও অনেকে করে। এসব কাজ করে তারা পরিবারের সচ্ছলতা আনার চেষ্টা করে। সামগ্রিকভাবে মনে করা হয় মেয়েরা উপার্জনক্ষম নয়। বিয়ের পর মেয়েরা অন্যের পরিবারে চলে যাবে, তাই তাদের উপার্জনক্ষম করার জন্য অর্থ ব্যয় করা পরিবারের অর্থের অপচয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।

বর্তমানে মেয়েদের সম্পর্কে এই ধারণা কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, নানা ধরনের কাজ করছে অফিস-আদালতে চাকরি, কলকারখানার কাজ, যানবাহন পরিচালনা, কারিগরি কাজ, কারু শিল্প, ব্যবসা এসব কাজে তারা অংশগ্রহণ করছে। তবে পুরুষের চেয়ে তাদের সংখ্যা কম। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠায় তারা ছোট

পরিবারের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে ফলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে।

* মেয়েদের সম্পর্কে আর একটি ভ্রান্ত ধারণা যে তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল। সামাজিক প্রথার কারণে একটু বড় হলেই মেয়েদের চলাফেরা গৃহ পরিবেশে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বাইরের অনেক কাজের জন্য তারা পুরুষের ওপর নির্ভর করে। নারীদের এই নির্ভরশীলতার জন্য পুরো সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার ও অনগ্রসর মনোভাবই দায়ী।

তবে আশার কথা আমাদের দেশের মত অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মেয়েরা বর্তমানে আত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক হারে মেয়েরা ভর্তি হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার কাজকর্মে ও পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। বর্তমান পরিবেশে মেয়েরা আত্মনির্ভর হওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছে। পুরুষের প্রতি নির্ভরশীলতা কমে যাবার ফলে পূর্বে যেমন ছেলে সন্তানের আশায় অধিক সন্তান কামনা করত তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

* মেয়েদের সম্পর্কে আর একটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে, তারা মা–বাবার দুঃসময়ে সহায়ক হতে পারেনা। ব্যাপক অশিক্ষা ও সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে মেয়েরা স্বাবলম্বী নয়। মা–বাবা বিপদের সময় তাদের উপর নির্ভর করতে পারেনা। সেজন্য তারা ছেলে সন্তান কামনা করে। এই ধারণা বর্তমানে পাল্টে যাচ্ছে। মেয়েরা মা–বাবার বিপদে এগিয়ে আসছে, অর্থ সাহায্য করছে, অসুখে সেবা করছে এবং বার্ধক্যে নিরাপত্তা দিচ্ছে। শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম মেয়েরাই মা–বাবার দুঃসময়ে সাহায্য করছে। অতএব ছেলে–মেয়ে সন্তানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকছে না।

মেয়েদের সম্পর্কে আর একটি ভুল ধারণা যে, তারা প্রয়োজনের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে তারা পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দিতে পারে। শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দর নায়েক, ইংল্যান্ডের মার্গারেট থ্যাচার, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, বাংলাদেশের বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, এবং পাকিস্তানের বেনজীর ভুট্টো প্রমুখ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

* নারীদের সম্পর্কে সমাজের লোকদের প্রচলিত ধারণা যে, তারা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে দুর্বল, তারা কোনো কঠিন কাজ পুরুষের মত করতে পারেনা। এই বিশ্বাস বর্তমানে কিছুটা শিথিল হচ্ছে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কর্মক্ষম হচ্ছে পুরুষের মত যে কোনো জীবিকায় যেমন– বিজ্ঞানী, বৈমানিক, প্রকৌশলী, আইনজীবি, প্রশাসক, শিক্ষক, সার্ভেয়ার ইত্যাদি কাজে মহিলারা নিয়োজিত আছেন। এমনকি সামরিক বাহিনীসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেও তারা দায়িত্ব পালন করছেন। কর্মের জন্য তারা ঘর থেকে দূর দূরান্তে যাচ্ছেন। এসব দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় মেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে সাহসী, আত্ম–প্রত্যয়ী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে পারে। আমাদের সমাজে অধিক সন্তান লাভের একটা প্রবণতা লক্ষণীয়। দরিদ্র ও নিরক্ষর লোকদের ধারণা তাদের অনেক সন্তান হলে বিশেষ করে ছেলে সন্তান হলে পরিবারের আয় উপার্জনের সুবিধা হবে। সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় পরিবারে অধিক সন্তান হলে খাদ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে কিছু শিশু মারা যায়। অনেকে অসুস্থ, দুর্বল ও অকর্মণ্য হয়ে পরিবার ও দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এসব কারণে দেশে জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা জনগণের অধিক সন্তান লাভের প্রতি নিরুৎসাহিত করছে।

নারীদের সম্পর্কে এতকাল যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং ছেলে সন্তানের প্রতি যে অযৌক্তিক আগ্রহ ছিল তা কমে আসছে। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সার সংক্ষেপ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

(১) জন্মহার ও মৃত্যু হারের ব্যবধান : জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু। যতশিশু জন্মগ্রহণ করে তার চেয়ে কম সংখ্যক মারা গেলে সে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(২) মৃত্যুহার হ্রাস: মৃত্যুহার হ্রাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

(৩) বাল্যবিবাহ : বাল্যবিবাহের কারণে শিশু জন্মহার বৃদ্ধি পায় ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(৪) বসতি স্থানান্তর : জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে বসতি স্থানান্তর। দুইদেশের মধ্যে অধিবাসীদের স্থানান্তরকে দেশান্তর বলে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

১। পরিবারে অস্বচ্ছলতা দেখা যায়।

২। মাথাপিছু আয় কমে যায়।

৩। সদস্যদের জীবন যাত্রার মান হ্রাস পায়।

৪। লেখাপড়ার সুযোগ করা সম্ভব হয় না।

৫। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সকলেই দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

জনসংখ্যাজনিত সমস্যা সমাধানের উপায়

১। বাল্যবিবাহ রোধ।

২। উৎপাদনমুখী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩। শিক্ষার প্রসার ঘটানো যেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়।

৪। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাক্রম ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে মা–বাবাকে সচেতন করে তোলা।

৫। ছোট পরিবারের উপকারিতা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

নারীদের প্রতি সমাজের ভ্রান্ত ধারণা

১। মেয়েরা আয় উপার্জন করতে পারে না।

২। দেশ উন্নয়নের কাজ করতে পারে না।

৩। মেয়েরা পুরুষের ওপর নির্ভরশীল।

৪। মেয়েরা আত্মনির্ভরশীল নয়।

৫। মেয়েরা পিতামাতার দুঃসময়ে সহায়ক হতে পারে না।

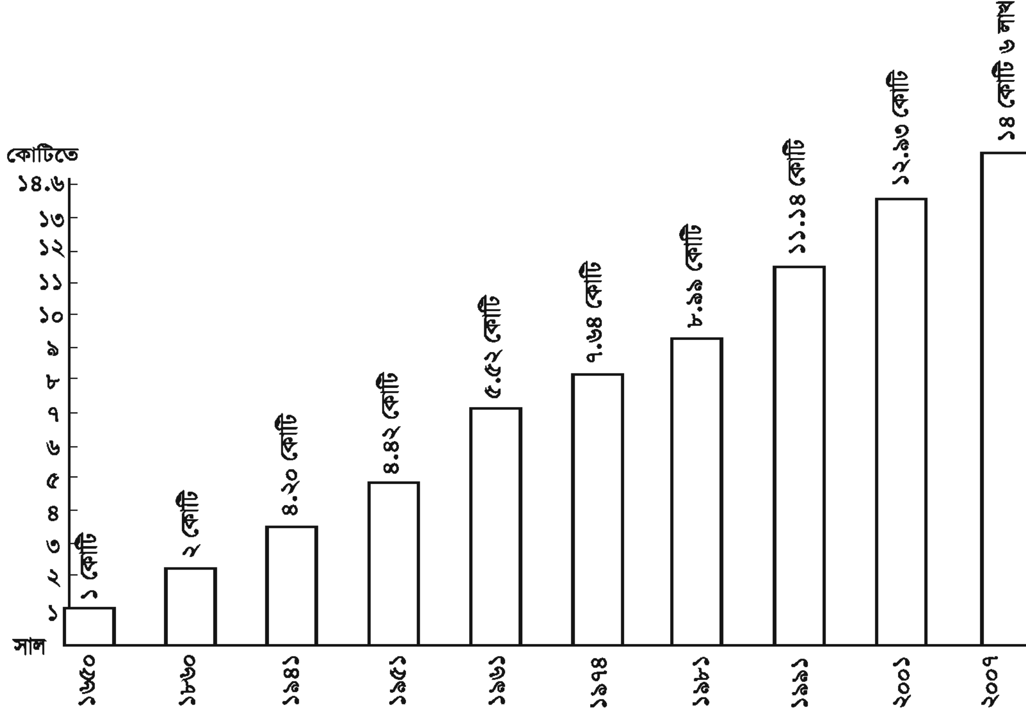
৬। তারা প্রয়োজনের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

৭। তারা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে দুর্বল।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

নিম্নের লেখচিত্র পর্যবেক্ষণ করে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



১. ১৮০৪ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত ছিল?
   - ক. ৫০ কোটি
   - খ. ১০০ কোটি
   - গ. ১৫০ কোটি
   - ঘ. ২০০ কোটি

২. ১৯২৭ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে জনসংখ্যার পার্থক্য কত?
   - ক. ২০০ কোটি
   - খ. ৪০০ কোটি
   - গ. ৬০০ কোটি
   - ঘ. ৮০০ কোটি

৩. বসতি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
   - i. বহিরাগমনের ফলে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়
   - ii. বহির্গমন দেশের জনসংখ্যা হ্রাস করে
   - iii. স্থানান্তর ও জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে না।

নিচের কোনটি সঠিক?
   - ক. i
   - খ. ii
   - গ. iii
   - ঘ. i ও iii

৪. স্থূল জন্মহার হল–
   - ক. জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্য
   - খ. শিশু মৃত্যুর সংখ্যা
   - গ. মৃত শিশুর জন্মলাভ
   - ঘ. জীবিত শিশুর জন্মলাভ

৫. বাল্যবিবাহের প্রভাবে কী হয়?
   - ক. পরিবারে অশান্তি দেখা দেয়
   - খ. সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটে
   - গ. জন্মহার বৃদ্ধি পায়
   - ঘ. মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাবেয়ার বাবা প্রতিদিন কাজ শেষে ঘরে এসে বিশ্রাম নিতেন। কিন্তু রাবেয়ার মার পরিবারের সব সদস্যের সেবাযত্ন, হাঁস–মুরগি পালনসহ সংসারের সব কাজ সারতে সারতে দিন শেষ হয়ে রাতের অনেকটা সময় কেটে যেত। এরপরেও রাবেয়ার বাবা তার মায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য দিতেন না। এ অবস্থা দেখে রাবেয়া বিয়ের পর তার স্বামীর পাশাপাশি অর্থ আয়ের পথ বেছে নিয়ে সংসার জীবন যাপনের সংকল্প গ্রহণ করে।

ক. রাবেয়ার পিতামাতার পরিবার কী ধরনের সমাজ ব্যবস্থার চিত্র?

খ. নারী সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত ধারণা জন্য রাবেয়ার মাতা সঠিক মর্যাদা পেল না, তা বর্ণনা কর।

গ. রাবেয়ার মায়ের মত নারীদের সঠিক মর্যাদা দান কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে ভূমিকা রাখবে?

ঘ. রাবেয়ার সংকল্প নারী সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত কোন ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাবে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ মতামত দাও।

২. আকরাম সাহেবের জন্ম কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায়। তিনি সরকারি চাকুরি করতেন। ২০ বছর আগে তিনি সৌদি আরব চলে যান। সেখানে ব্যবসা করে তিনি অনেক টাকা আয় করেন। গত বছর তিনি দেশে ফিরে দেখলেন তাঁর গ্রামের সেই শান্ত, সুন্দর অবস্থা আর নেই। চারদিকে লোকের ভিড়। অধিকাংশ পরিবারই অশিক্ষিত এবং পরিবারগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। বর্ধিত লোকসংখ্যার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা অধিকাংশের নেই। তাই তাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ নিচে নেমে যাচ্ছে।

ক. আকরাম সাহেব সৌদি আরব গমন করার ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার কী পরিবর্তন হয়?

খ. পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান প্রভাব বর্ণনা কর।

গ. কেন আকরাম সাহেবের গ্রামের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আকরাম সাহেবের গ্রামের লোকদের জীবনযাত্রার মান নিচে নেমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

৩. এক সময় গ্রামের সবাই জরিনাকে বোঝা মনে করত। এখন জরিনার আর পূর্বের অবস্থা নেই। জরিনা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে কিছু লেখাপড়া শিখে জন্মহার, মৃত্যুহার, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হয়। সর্বোপরি স্থানীয় এনজিও থেকে কিছু ঋণ নিয়ে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলে। বর্তমানে জরিনা সমাজ কিংবা দেশের বোঝা নয়। জরিনার মত অনেক নারীই আজ শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছেন।

ক. ২০০১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

খ. পূর্বে জরিনাকে গ্রামের লোকেরা বোঝা মনে করত কেন?

গ. জরিনা কেন নিজেকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন?

ঘ. 'বর্তমানে জরিনা আর সমাজ কিংবা দেশের বোঝা নয়।' উক্তিটির যথার্থতা দেখাও।

৪. রহিমা খাতুন একজন অশিক্ষিত গৃহিণী। তাঁর স্বামী একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাদের আট ছেলেমেয়ে। স্বামীকে বারবার বুঝানোর পরও স্বামী সংসার ছোট রাখতে রাজি নন। মূলত সংসারের রহিমার মতামতের কোন মূল্য নেই। উপরন্তু তার উপর চলতে থাকে অমানুষিক নির্যাতন। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একদিন সেখান থেকে বাপের বাড়িতে পালিয়ে আসেন। তারপর বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে একটা এনজিওতে মাসিক ২০০০/– টাকা বেতনে চাকরি পেয়ে যান। খবর পেয়ে স্বামী এসে ক্ষমা চেয়ে তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যান। এখন সংসারে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

ক. বাংলাদেশে পরিবারের অধিকাংশ কাজ কারা করে?

খ. সংসারের রহিমার মতামতের কোন মূল্য ছিল না কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. রহিমার মত বঞ্চিত নারীরা কীভাবে সমাজে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে?

ঘ. রহিমার জীবনের আলোকে বাংলাদেশের সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।